মাসুদ রানা

মুক্তিপণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৩১৪

মুক্তিপণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7314-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-314
MUKTIPAN
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

একত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়☆ভারতনাট্যম ☆স্বর্ণমৃগ ☆দুঃসাহসিক☆মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা☆দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর☆সাগরসঙ্গম☆রানা! সাবধান!!☆বিস্মরণ☆রত্নদ্বীপ☆নীল আতঙ্ক ☆কায়রো মৃত্যুপ্রহর☆গুপ্তচক্র☆মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ☆রাত্রি অন্ধকার☆জাল☆অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ☆ক্ষ্যাপা নর্তক☆শয়তানের দূত ☆এখনও ষড়যন্ত্র ☆প্রমাণ কই? বিপদজনক☆রক্তের রঙ☆অদৃশ্য শত্রু☆পিশাচ দ্বীপ☆বিদেশী গুপ্তচর☆ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা☆ তিনশত্রু ☆অকস্মাৎ সীমান্ত ☆সতর্ক শয়তান☆নীলছবি ☆প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক☆এসপিওনাজ☆লাল পাহাড় ☆হৃৎকম্পন☆প্রতিহিংসা☆হংকং সম্রাট কুউউ☆বিদায় রানা☆প্রতিদ্বন্দ্বী☆আক্রমণ☆গ্রাস☆স্বর্ণতরী☆পপি☆জিপসী☆আমিই রানা সেই উ সেন☆হ্যালো, সোহানা ☆হাইজ্যাক ☆ আই লাভ ইউ, ম্যান ☆ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়☆টার্গেট নাইন☆ বিষ নিঃশ্বাস☆প্রেতাত্মা ☆বন্দী গগল ☆জিম্মি তুষার যাত্রা☆স্বর্ণ সংকট☆সন্ন্যাসিনী☆পাশের কামরা☆নিরাপদ কারাগার ☆স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ☆হামলা☆ প্রতিশোধ☆মেজর রাহাত☆লেনিনগ্রাদ☆অ্যামবুশ☆আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর☆নকল রানা☆রিপোর্টার☆মরুযাত্রা☆বন্ধু☆সংকেত☆স্পর্ধা☆চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ☆চারিদিকে শত্রু☆অগ্নিপুরুষ☆অন্ধকারে চিতা☆মরণ কামড়☆মরণ খেলা অপহরণ☆আবার সেই দুঃস্বপ্ন☆বিপর্যয়☆শান্তিদূত☆শ্বেত সন্ত্রাস☆ছদ্মবেশী☆কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ☆সময়সীমা মধ্যরাত☆আবার উ সেন ☆বুমেরাং☆কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ☆কুচক্র☆চাই সাম্রাজ্য☆অনুপ্রবেশ☆যাত্রা অশুভ☆জুয়াড়ী☆কালো টাকা কোকেন সম্রাট ☆বিষকন্যা ☆সত্যবাবা ☆যাত্রীরা হুঁশিয়ার ☆অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯☆অশান্ত সাগর ☆শ্বাপদ সংকুল☆দংশন ☆প্রলয় সঙ্কেত☆ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ☆ডাবল এজেন্ট☆আমি সোহানা ☆অগ্নিশপথ ☆জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান☆গুপ্তঘাতক ☆নরপিশাচ ☆শত্রুবিভীষণ☆অন্ধ শিকারী ☆দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ☆কালো ছায়া☆নকল বিজ্ঞানী☆বড় ক্ষুধা☆স্বর্ণদ্বীপ☆রক্তপিপাসা ☆অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন☆নীল দংশন☆সাউদিয়া ১০৩☆কালপুরুষ☆নীল বজ্র☆মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট☆অমানিশা☆সবাই চলে গেছে☆অনন্ত যাত্রা ☆রক্তচোষা ☆কালো ফাইল মাফিয়া☆হীরকসম্রাট☆সাত রাজার ধন☆শেষ চাল☆বিগব্যাঙ☆অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ☆মহাপ্রলয়☆যুদ্ধবাজ☆প্রিন্সেস হিয়া☆মৃত্যুফাঁদ☆শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ☆মায়ান ট্রেজার ☆ঝড়ের পূর্বাভাস☆আক্রান্ত দূতাবাস☆জন্মভূমি দুর্গম গিরি ☆মরণযাত্রা ☆মাদকচক্র ☆শকুনের ছায়া☆তুরুপের তাস☆কালসাপ গুডবাই, রানা ☆সীমা লঙ্ঘন☆রুদ্রঝড়☆ কান্তার মরু ☆ কর্কটের বিষ☆বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর☆নরকের ঠিকানা☆অগ্নিবাণ☆কুহেলি রাত☆বিষাক্ত থাবা☆জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি☆সেই পাগল বৈজ্ঞানিক☆সার্বিয়া চক্রান্ত☆দুরভিসন্ধি☆কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী ☆ পালাও, রানা! ☆ দেশপ্রেম☆ রক্তলালসা ☆ বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট☆ ভাইরাস X-99।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

এক সাগর গভীর ঘাস আর তার ওপর বিস্তৃত রাশি রাশি লাল ফুলের মাঝখানে আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, সারা অঙ্গে ঢলঢল যৌবন; সুন্দরীর নগ্ন স্তনে পেয়ালার আকৃতি পেয়েছে তার নরীন দুই হাত, নাভিমূল ঢেকে রাখা রত্ন থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নীল দ্যুতি, যেন মদিরার অফুরন্ত উৎস, কোমল ফুলশয্যা আর অঢেল টাকার প্রতি ইঙ্গিত–সব মিলিয়ে সীমাহীন ভোগবিলাস আর আনন্দফুর্তিতে গা ভাসানোর লোভনীয় আমন্ত্রণ। তার যদি কোন নাম থাকেও, উল্লেখ করার গরজ দেখায়নি কেউ। হয়তো প্রয়োজনও নেই, কারণ স্ট্যাচুটা দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক ক্যাসিনোর প্রবেশপথে। শুধু নিস শহরে নয়, গোটা ফ্রান্সে এটাই সবচেয়ে বড় জুয়ার আসর। ভাগ্যটাকে বাজিয়ে দেখার নেশায় সারা দুনিয়া থেকে এখানে ছুটে আসে জুয়াড়ীরা। ভূমধ্যসাগরের কিনারা ধরে বিস্তৃত রাস্তাটার নাম প্রম্যানাড দ্য অ্যাঙ্গলাইস। সন্ধে লেগে আসতে স্ট্যাচুর পিছনে ঘিয়ে রঙের চারতলা দালানটার কপালে নিওনসাইন জ্বলে উঠল–ক্যাসিনো: প্যালাইস ডে লা মেডিটারেইনিয়ান। একটা স্পটলাইট সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলল মর্মর মূর্তিটাকে; দেশী-বিদেশী জুয়াড়ীরা যেটাকে 'কুমারী সুলক্ষণা' বা 'অক্ষতযোনি ভাগ্যদেবী' বলেই জানে।

প্রম্যানাড দ্য অ্যাঙ্গলাইস ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ের তুলনায় দ্বিগুণ চওড়া, রেন্ট-আ-কার কোম্পানির সিত্রোঁ

কনভার্টিবল মাসুদ রানাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল। প্যালাইস ডে লা বা নিস-এর ক্যাসিনো পাড়ায় সুদর্শন তরুণদের আগমন নতুন কিছু নয়, ভ্রমণবিলাসী পথিকরা রোজই দু'পাঁচজন রাজপুত্রকে দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু তারপরও উপস্থিত ট্যুরিস্টদের মধ্যে আজ একটা বিস্ময় মেশানো মুগ্ধতা লক্ষ করা গেল, বিশেষ করে মেয়েরা অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে বারবার তাকাচ্ছে ওর দিকে। দীর্ঘ একহারা কাঠামো, অত্যন্ত নমনীয়; অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে শক্তি ও ক্ষিপ্রতার স্পষ্ট আভাস; মায়াভরা চোখে এক সাগর বিষাদ, ব্যাক ব্রাশ করা লম্বা কালো চুলে প্রাচ্যের কি এক গোপন রহস্য।

দ্রুত সামনে চলে এসে সসম্মানে মাথা নোয়াল ইউনিফর্ম পরা পোর্টার, পরক্ষণে ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে সিত্রোঁর দিকে রওনা হলো, গাড়ির চাবিসহ পাওয়া রিঙটা আঙুলে বাধিয়ে ঘোরাচ্ছে। তিনটে ধাপ টপকে সুইং ডোর-এর দিকে এগোল রানা, এবার পথ আটকাল শুভ্রবসনা দুই তরুণী, একজন ওর ধূসর কোটের বাটনহোলে লাল গোলাপ গুঁজে দিল, আরেকজন দরজা মেলে ধরে সাদর আমন্ত্রণ জানাল ক্যাসিনোয়।

বিশাল হলরুমে বিভিন্ন ডিজাইনের দশ-বারো সেট সোফা। দু'দিকের পুরোটা দেয়ালের জায়গায় দুই প্রস্থ সিঁড়ি। দোতলায় বার, সেটাকে ছুঁয়ে ধাপগুলো উঠে গেছে তিনতলায়। প্রবেশ মুখে গার্ড দেখা গেল, ইউনিফর্ম ফুলে থাকায় শোল্ডার হোলস্টারের অস্তিত্ব গোপন থাকছে না। একজন ইন্সপেক্টরসহ পুলিসের ছোট একটা দলও আছে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে, কাঠের চেয়ারে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। দরজা খুলে দিল একজন গার্ড।

তিনতলার ফ্লোর বিভিন্ন মঞ্চে বিভক্ত, তিনটে করে ধাপ টপকালেই এক মঞ্চ থেকে আরেক মঞ্চে যাওয়া যায়, সব মিলিয়ে জায়গাটা এত বড় যে মহল্লার ছেলেরা অনায়াসে ফুটবল খেলতে পারবে। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হলেও, পুরোটা মেঝে একটাই প্রকাণ্ড লাল কার্পেটে ঢাকা। রানার সরাসরি সামনে মেরুন পর্দা দিয়ে

আড়াল করা হয়েছে সারি সারি ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, পর্দার ফাঁক দিয়ে সাগর দেখা যাচ্ছে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর বাইরে অপরিসর ঝুল-বারান্দায় জোছনা আর শীতল বাতাস গায়ে মেখে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণীরা বসে আছে, গল্প করার ফাঁকে চুমুক দিচ্ছে শ্যাম্পেন বা ব্র্যান্ডির গ্লাসে।

টেবিলগুলো রানার বাম দিকে। রুলেত, ডাইস, বাকারা থেকে শুরু করে ব্ল্যাকজ্যাক পর্যন্ত সব খেলার ব্যবস্থাই আছে। রক্ত লাল ও কমলা শেড-এর ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত কোমল সাদা আলোর নিচে বন বন করে ঘুরছে অলঙ্কৃত রূপালি হুইল, মখমলে ঘষা খেয়ে ফিসফিস আওয়াজ করছে তাস, ফরমিকা মোড়া বোর্ডে জলতরঙ্গের শব্দ তুলে নাচছে সাদা কড়ি, টেবিলে টেবিলে তৈরি হচ্ছে চিপস-এর পাহাড়, আবার পাহাড় ধসের ঘটনাও ঘটছে। এ হলো বিরতিহীন ভাগ্যপরীক্ষা, ঝুঁকি নিয়ে সব হারানোর অথবা পাওয়ার শ্বাসরুদ্ধকর খেলা।

নির্ভেজাল ছুটিতে থাকলেও, রানার জন্যে জরুরী প্রথমেই চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়া কারা এখানে খেলতে এসেছে। যস্মিন দেশে যদাচার, 'অন দা হাউস' বলে অষ্টাদশী ললনা ট্রে থেকে শ্যাম্পেন ভর্তি একটা গ্লাস বাড়িয়ে দেয়ায় এ-মুহূর্তে মদ্যপানের ইচ্ছে না থাকলেও নিতে হলো; ওটায় চুমুক দিক বা না দিক ফ্রেঞ্চ মেহমানদারির ঐতিহ্যকে অসম্মান করা যায় না। সব কিছুর মত জুয়ারও একটা মরশুম আছে, সেটা হলো শীতের শেষভাগ, ট্যুরিস্টরা যখন দলে দলে শিল্প-সাহিত্যের পীঠস্থান ফ্রান্সে আসতে শুরু করে। মরশুম মাত্র শেষ হয়েছে, তাই লোকজনের ভিড় কিছুটা কম। বেশ কয়েকটা টেবিল তুলে ফেলা হয়েছে।

ব্ল্যাকজ্যাক আর ক্র্যাপস টেবিলে আমেরিকানদের ভিড়ই বেশি। বাকারা খেলছে ইংরেজরা, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই প্রৌঢ়। বহুজাতিক ভিড় দেখা গেল রুলেত টেবিলে। সাদা শার্ট আর নীল সুট পরা জাপানিরা এখানে সংখ্যাগুরু। আলখেল্লা পরা

পাঁচ-ছ'জন আরবকে দেখল রানা। তাছাড়াও আছে গ্রীক, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, স্প্যানিয়ার্ড, জার্মান, ইংলিশ, চাইনিজ, ইন্ডিয়ান ও আমেরিকান। ওরা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী, পরিচয় না থাকলেও কাগজে নিয়মিত খবর হওয়ার কারণে দু'একজনকে চিনতে পারল ও। না, চিহ্নিত কোন টেরোরিস্ট বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোন গডফাদারকে দেখা যাচ্ছে না।

'নো, নেভার।' নিজেকে সতর্ক করল রানা। 'বেড়াতে এসে তুমি কোন উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে না।' আসলে ব্যাপারটা হলো এসপিওনাজ পেশাটাই এমন যে আন্তর্জাতিক সমাজের সমস্ত রীতি, অনুষ্ঠান, উৎসব, আচার ও বিনোদন সম্পর্কে শুধু পরিষ্কার ধারণা থাকলেই হবে না, মাঝেমধ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আবার নতুন করে সব ঝালাই করে নেয়াটাও জরুরী। পেশাদার স্পাইকে সম্ভাব্য সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। লেখকের সঙ্গে এখানে তার খুব মিল। অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখক যাই লিখুন, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত হবে না। আর অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে একজন স্পাই দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, এবং এই ইতস্তত ভাব বা অজ্ঞতা তার মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। তাই ছুটি নিয়ে বিদেশে বেড়াতে এলেও পুরানো অভিজ্ঞতাগুলো ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ কখনোই রানা হাতছাড়া করে না। এমনকি সদ্য পরিচিত কোন পরমাসুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্য উপভোগ করার সময়ও নিজেকে মুহূর্তের জন্যে ভুলতে দেয় না যে বিসিআই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যার কাজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে-কোন ষড়যন্ত্র বানচাল করা, সেই প্রতিষ্ঠানের একজন এজেন্ট সে, এবং এই মেয়েটি শত্রুপক্ষের রোপণ করা টোপও হতে পারে।

ইঙ্গিতে অতিরিক্ত চেয়ার দিতে বলে অতি উৎসাহী কয়েকজন বৃদ্ধা ভিড় জমালেন একটা টেবিলে, হাতের পেন্সিল দিয়ে কাগজের টুকরোয় সংখ্যা লিখছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

প্রবেশ মুখের কাছাকাছি একটা টেবিলে দাঁড়াল রানা, নীল গাউন পরা ডাইনীসদৃশ এক বুড়ির পিছনে; সুবিধে হলো, আসরে নতুন কেউ ঢুকলে সহজেই তাকে দেখতে পাবে ও।

একজন ক্রুপিয়ের হাতে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিল রানা। বলল, 'একশোর পঞ্চাশটা পীস দাও।' টেবিল ভল্টের মুখ লোভীর মত হাঁ করে আছে, তামায় মোড়া চকচকে ঠোঁট দিয়ে কড়কড়ে নোটগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। বিভিন্ন অঙ্কের বহুরঙা চিপসে ফুলে ঢোল হয়ে আছে ট্রেজারি, সেখান থেকে পঞ্চাশটা লাল ডিস্ক হড়কে রানার দিকে চলে এল। মুঠো থেকে ওগুলোকে জ্যাকেটের পকেটে ঝরে পড়তে দিল ও।

বাজি ধরার ডাক, ছুঁড়ে দেয়া চিপসের নৃত্য, হুইলের সশব্দ ঘূর্ণন, ক্রুপিয়ের উল্লাসধ্বনি বা সরস টিপ্পনী বেশ কিছু সময় একটা ঘোরের মধ্যে বন্দী করে রাখল রানাকে; তাসত্ত্বেও, প্রতিবার দরজা খোলার শব্দ হতে চোখ তুলে একবার করে ঠিকই তাকাল।

এক সময় খেলায় যোগ দিল রানা। বারবার ওর চিপস হজম করে ফেলল টেবিল। তবে হঠাৎ যখন ফিরিয়ে দিল, একবারেই দশগুণ। ধীরে ধীরে বড় দান ধরার দিকে এগোচ্ছে ও।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কখনও হার কখনও জিত একঘেয়ে লাগছে। বিভিন্ন নম্বরে বাজি ধরাটা বিরক্তিকর হয়ে ওঠায় একটা মাত্র নম্বরে পাঁচশো ফ্রাঙ্ক খেলল রানা। ওর অফিশিয়াল নম্বর নাইন-এ। হারল। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর নম্বরে খেলল। এবারও হারল। নির্দিষ্ট নম্বর আছে রানা এজেন্সিরও, সেটায় বাজি ধরেও হারল। সবশেষে পকেট খালি করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নম্বরে সব চিপস ঢেলে দিল রানা। নির্দিষ্ট ওই নম্বরে শুধু ওর চিপসই পড়ে আছে, জেতার সম্ভাবনা সাঁইত্রিশ ভাগের এক ভাগ। ক্রুপিয়ে কব্জি ঝাঁকাল, প্রকাণ্ড হুইল ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করল। হাতীর দাঁতের

বলটা ঘড়ির কাঁটার অনুকরণে আরেকদিকে রওনা হলো ঠিক যেন অন্ধকার আকাশের গায়ে একটা উল্কার মত, কালো হুইলের গতিময়তার বিপরীতে। 'এইবার দেখা যাবে কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে!' বিড়বিড় করল হুইল বস্। হুইল গতি হারাচ্ছে। জুয়াড়ীদের মধ্যে টান টান উত্তেজনা। বলটা ট্র্যাক ছেড়ে নেমে পড়ল, লাফ দিয়ে সেপারেটর পেরুল–গতি কমছে–একটা নম্বরের পকেটে পড়তে গিয়েও পড়ল না, রাহাত খানের নির্দিষ্ট নম্বরে ঢুকেও বেরিয়ে এল–পর পর দু'বার–তারপর, অবশেষে, ছোট্ট তিনটে দর্শনীয় লাফ দিয়ে ওই নম্বরেই ঢুকে চুপটি করে বসে থাকল।

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

চিপসগুলো রানার দিকে ঠেলে দিল ক্রুপিয়ে। ওগুলোর মধ্যে পাঁচশো ও হাজার ফ্রাঙ্কের চিপস বিশটার কম হবে না। কয়েকটা একশো ফ্রাঙ্কের চিপস ক্রুপিয়ের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, বাকি সব নিজের দিকে টেনে আনার জন্যে ঝুঁকল। তারপর যখন সিধে হচ্ছে, দেখতে পেল তাকে।

বহুকাল এমন ভাবে চমকায়নি ও। মানুষ বোধহয় ভূত না দেখলে এতটা চমকায় না। সরাসরি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। এর বয়স কম, কিন্তু চেহারায় এত বেশি মিল যে বাংলা ছায়াছবির স্বনামধন্যা অভিনেত্রী তনিমার ভক্তরা দেখলে রীতিমত আঁতকে উঠবে। আঁতকে উঠবে, কারণ, তনিমা বাংলাদেশের, অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যস্ততম, জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন এবং মারাও গেছেন বেশ অনেক বছর আগে। সময়ের অভাবে নতুন বা পুরানো কোন সিনেমাই দেখার সুযোগ হয় না রানার, সেই অর্থে কারও ভক্ত হবার প্রশ্ন ওঠে না ওর, তবে তনিমার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন ও, শুনেছে এমন অভিনেত্রী নাকি জন্মেনি এদেশে আর। সিনে ম্যাগাজিনে তাঁর ছবি অনেকবারই দেখেছে রানা, ফ্রান্সের নিস শহরের এই ক্যাসিনোয়

হঠাৎ হুবহু সেই একই চেহারার একটা মেয়েকে দেখে চমকে ওঠার সেটাই কারণ। তনিমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। ভাবছে, ভদ্রমহিলা কি কোন বিদেশী পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন, আর এই মেয়েটি তাদের সন্তান? নাহ্, তাও সম্ভব নয়, কারণ তনিমা মারা গেছেন অন্তত ত্রিশ বছর আগে, কিন্তু এই মেয়েটির বয়স পনেরো কি ষোলো, তার বেশি হতেই পারে না।

মিল যেমন আছে, অমিলও কম নয়; সে-সব এখন একটা একটা করে ধরা পড়ছে রানার চোখে। কালোর সঙ্গে মধুর রঙ মেশালে যেমনটি দাঁড়ায়, চুলগুলো ঠিক সেরকম; টান টান করে আঁচড়ানো, খুলির পিছনে মস্ত একটা খোঁপা, ম্লান সবুজ রিবন দিয়ে বেঁধে রেখেছে। চোখ দুটোও কালো নয়, প্রায় সবুজ। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বাও, পাঁচ ফুট ছয় কি সাড়ে ছয়। তনিমার সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবে সন্তানের সন্তান হওয়া বিচিত্র নয়, অন্তত রক্তের সম্পর্ক তো থাকতেই হবে, তা না হলে এতটা মিল কি করে হয়? রঙ আলাদা হলেও, সেই একরাশ চুল, সেই টানা-টানা চোখ, সেই ছোট্ট ও খাড়া নাক; এমনকি ভুরু, ঠোঁট, চিবুক, চোয়ালের হাড়। এমন কি দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।

দামী হলেও ঘরোয়া একটা ড্রেস পরেছে, এখানকার পশ্ পরিবেশের সঙ্গে বেমানানই বলতে হবে; একটু আঁটসাঁট হওয়ায় প্রথমেই চোখে পড়ে ভরাট ও উন্নত বুক।

বসার জন্যে চেয়ার দেয়া হলেও বসল না। হাতের ছোট্ট পার্সটা খুলে পাঁচশো ফ্রাঙ্কের দুটো নোট বের করে ক্রুপিয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরল, বলল, 'পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের বিশটা চিপস দিন।' রানা লক্ষ করল, ভাষাটা ইংরেজি, বাচনভঙ্গি আমেরিকান।

একটা কাঠের স্লাইডে নোট দুটো আটকাল ক্রুপিয়ে, তারপর অতৃপ্ত ও লোভী ভল্টের নির্লজ্জ ঠোঁটে নামিয়ে দিল সেটা।

বাহু ও পাঁজরের মাঝখানে পার্সটা গুঁজে রেখে দু'হাত বাড়িয়ে

চিপগুলো নিজের সামনে টেনে আনল মেয়েটি তারপর শিশুরা যেভাবে বিস্কিটের স্তূপ তৈরি করে সেভাবে সাজাল। ভঙ্গিটার মধ্যে এত বেশি সরলতা ও মনোযোগ, লক্ষ করে হাসল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলের ওদিক থেকে মুখ তুলে তাকাল সে, একজোড়া পান্নার মত জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ দুটো। তারপর বিব্রত [illegible]ধ করল; প্রজাপতির ডানার মত দ্রুত ওঠানামা করল চোখের পাতা, চোয়ালের কাছে গালের রঙ লালচে হয়ে উঠল দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকল টেবিলের ওপর।

কিশোরীর চোখমুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠছে। চেয়ারে বসা জুয়াড়ীদের মাঝখানে সরে এল, হাতের হলুদ একটা চিপ আস্তে করে রাখল সাত নম্বরে। হারল সে। এরপর উনিশে খেলেও জিততে পারল না। সতেরোয় হারল, হারল ছাব্বিশে ও তেত্রিশে

পরপর দশ দান, প্রতিবার মাত্র একটা নম্বরে খেলে, সবগুলোতে হারল মেয়েটা। এখন সে আগের চেয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে, আঁটসাঁট কাপড়ে ঢাকা বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছে। দাঁত দিয়ে বেগুনি নেইলপলিশ লাগানো নখ কামড়াল। অপর হাতের মুঠোতেও কমে আসা চিপস রয়েছে। দুটো হাতই একটু একটু কাঁপছে। পরবর্তী দু'দানে একটা মুঠো খালি হয়ে গেল।

মেয়েটা জুয়ার নেশায় বা মজা করার জন্যে খেলছে, এ রানা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করতে রাজি নয়। ঠোঁটের ওপর, নাকের নিচে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার; গলার নিচেও ভেজা ভেজা ভাব, চকচক করছে ফর্সা ত্বক। আবার যখন হুইল ঘুরতে শুরু করল, নিচের ঠোঁটটা কামড়াল একবার। বাঁ হাতের মুঠোয় আর মাত্র কয়েকটা চিপ আছে, তারই একটা বের করল ডান হাতের আঙুল দিয়ে।

চিপটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর মন্ত্র পড়ার ঢঙে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল, 'প্লীজ! প্লীজ!'

নয় নম্বরে চিপটা রাখল। পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বল যে কক্ষপথ ধরে ভ্রমণ করছে তার উল্টোদিকে ঘুরছে হুইল; বাঁকা স্তর হয়ে সেটা নামতে শুরু করতেই হুইলম্যান চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখা যাক কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে!' টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা নারী-পুরুষের মধ্যে নিরবতা নেমে এল, দম আটকে অপেক্ষায় আছে সবাই।

রানা কালা হলে, শুধু মেয়েটার চোখ দেখে ফলাফল বলে দিতে পারত। নিচের পাতার গোড়ায় দু'ফোঁটা পানি জমেছে, গড়িয়ে পড়ে গাল ভিজিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। রানা তার শরীরটাকে হঠাৎ কাঠ হয়ে যেতে দেখল। কষ্ট করে খুব জোরে ঢোক গিলল একটা। পানির ফোঁটা দুটো ছোট হয়ে এল।

বাঁ হাত খুলে তাকাল মেয়েটা। আর মাত্র ছ'টা চিপস আছে। লম্বা ও সরু হাত একটা চিপ নিয়ে ঠেলে দিল চব্বিশ নম্বরে। এবার হুইল ঘুরতে শুরু করতেই চোখ বুজে ফেলল। কিন্তু ফলাফল আগের মতই, ভাল নয়।

ইতিউতি তাকাল মেয়েটা; রানার মনে হলো, ও চেয়ে আছে বুঝতে পেরে ভয় পাচ্ছে চোখাচোখি হয়ে যাবে, তাই ওর দিকে ভুলেও তাকাল না।

এরপর দশ মিনিটও পেরোয়নি, মেয়েটার হাতে এখন আর মাত্র দুটো চিপস। উদ্বেগ আর হতাশা এতটুকু কমেনি, তবে হাবভাব দেখে মনে হলো ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নিয়েছে সে।

নতুন দান শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েটা কোন রকম ইতস্তত করল না, দুটো চিপসের একটা তেরো নম্বরে রাখল। টেবিলের এদিক থেকে রানা বলল, 'গুড লাক।'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। হাসতে চেষ্টা করে পারল না, চিবুক আর ঠোঁটের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, থরথর করে কাঁপছে ওগুলো। চোখ দুটোও পানি এসে পড়ায় চকচক করছে।

দৃষ্টি নামিয়ে নিল সে, বিব্রত, রানার দিকে তাকাবে না।

রানার দৃষ্টি মেয়েটাকে ছাড়িয়ে গেল। তার পিছনে দরজা খুলে যাচ্ছে। একজন লোক ঢুকল ভেতরে। যেন একটা ধূর্ত শেয়াল, পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে আছে, লেজটা প্যান্টের ভিতর বলে দেখা যাচ্ছে না। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ভাঁজ করা বাকি দুই পা বুকের দু'পাশে তোলা। কোন মানুষের মুখ শেয়ালের সঙ্গে এরকম বদলে নেয়া যায়, রানার জন্যে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। সারা মুখে এত বেশি ক্ষতচিহ্ন, কতবার চাকুর পোঁচ লেগেছে জানতে হলে এক-দুই করে গুনতে হবে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা। ধূর্ত চোখের চঞ্চল দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, কাকে যেন খুঁজছে সে।

দুই

ছোট বড় অনেকগুলো জটলা ও ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েটাকে খুঁজে নিল লোকটার দৃষ্টি। কালো চকচকে ও চোখা জুতো সচল হলো, ধাপ থেকে লাল কার্পেটে নেমে এল।

টেবিল ঘুরে মেয়েটার দিকে এগোল রানা।

মেয়েটার পিছনে একটু ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়াল লোকটা, নির্দয় আনন্দে ক্ষতবিক্ষত মুখে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। হাত বাড়াল নির্দ্বিধায়, অমার্জিত লম্বা আঙুল মেয়েটার ডান বাহুর নরম মাংসে ডেবে গেল। তার কানে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

শিউরে উঠল মেয়েটা, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মুখ। দৃঢ়তার

সঙ্গে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে সে; তবে সাবধানে, যাতে কোন হাঙ্গামা না বাধে।

'টিক-টিক, টিক-টিক,' হুইলের গতি কমে আসতে উত্তেজিত হুইলম্যান সেকেন্ড গুনছে।

রানা উল্টোদিক থেকে মেয়েটার কাছে পৌঁছাল, চোখে-মুখে রাজ্যের সরলতা ও উচ্ছ্বাস। 'আরে, এই তো এখানে তুমি!' কণ্ঠে লটারি জেতার উল্লাস। 'ভয় হচ্ছিল হারিয়ে ফেললাম নাকি! রুলেতের শখ যদি মিটে থাকে তো চলো, পাওনা কফিটা খাইয়ে দিই তোমাকে।'

থামতেই রানা হুইলম্যানের গলা শুনতে পেল। 'সতেরো!' অর্থাৎ আবার মেয়েটা হেরেছে।

সস্তা সেন্ট মেখেছে লোকটা, বাতাসে নর্দমার দুর্গন্ধ পেল রানা। তার কালো সিল্ক সুট ক্যাসিনোর ম্লান আলোয় চকচক করছে। মেয়েটার বাহু থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে ফিরল সে। চেহারায় ও আচরণে ভদ্রোচিত একটা ভাব আনার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'কে আপনি?' ফিসফিস করল। সুলক্ষণই বলতে হবে। চায় না কোন রকম সিন ক্রিয়েট হোক।

'আপনি কে? মিস্টার স্মিথ, দা চাইল্ড অ্যাবিউজার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অ্যাঁ?'

রানা তার দিকে আর তাকাচ্ছে না।

'কি,' মেয়েটাকে বলল ও, 'কফি খাওয়ার ইচ্ছে এখনও আছে?'

'হ্যাঁ।' ইতস্তত ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' বলল রানা। 'এখন তাহলে আমরা রওনা হতে পারি, তাই না?'

'ওর হাতে সময় নেই,' বলল লোকটা। 'আসলে অন্য একটা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠলেও, গলা চড়াচ্ছে না।

'কথাটা বোধহয় সত্যি নয়,' বলল রানা। 'তাহলে ও আমাকে বলত।'

'দেখুন, মশিয়ো,' বলল লোকটা, 'নিজের ভাল চাইলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না।'

'এটা এখন আমার ব্যাপার।' রানা শান্ত অথচ দৃঢ়। 'শুনলে না, মেয়েটা আমার সঙ্গে কফি খেতে যেতে চাইছে!'

লোকটার সরু মুখ লাল হয়ে উঠল। 'নিষেধ করছি, মশিয়ো, আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না।' আস্তে করে জ্যাকেট একটু ফাঁক করে বেল্টে গোঁজা অস্ত্রটা দেখতে দিল রানাকে।

এক পলক দেখেই চিনতে পারল রানা, মেক্সিকান ট্রেজো পয়েন্ট টু-টু, মডেল ওয়ান। অস্ত্র পুরানো, তবে ভয়ঙ্কর। অস্ত্রটার ওপর দিকে একটা সিলেক্টর আছে, ফুল অটোতে দিয়ে ফায়ার করলে একনাগাড়ে আট রাউন্ড গুলি বেরুবে।

অকস্মাৎ হাঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। 'লুইজি, পাগলামি করবেন না!'

রানা বলল, 'ওটা তুমি চালাবে বলে মনে হয় না।'

'দেখা যাক,' কর্কশ গলায় হুমকি দিল লোকটা।

'জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি।' মেয়েটার হাত ধরল রানা, দু'জন একসঙ্গে পা বাড়াল দরজার দিকে।

'আমি কিন্তু...' শুরু করেও থেমে গেল লোকটা, চাপা স্বরে কাকে যেন অভিশাপ দিল।

কিংবদন্তীর শেয়াল যতই চতুর হোক, একই চেহারা হওয়া সত্ত্বেও লুইজির ঘটে বুদ্ধি কম, সঙ্কটে পড়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, সম্ভবত মনে করতে চাইছে এরকম পরিস্থিতিতে ঠিক কি করতে বলা হয়েছে তাকে।

ইতিমধ্যে তার ও ওদের মাঝখানে প্রতি ইঞ্চি বাড়তি দূরত্ব

গুলি করার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে তুলছে। লুইজি অ্যাকশন বোঝে, মাথা ঘামিয়ে সমস্যার সমাধান পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে তার, ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে প্যারিসে পৌঁছে যাবে ওরা।

মেয়েটার পিছনে একটা দেয়ালের মত হয়ে আছে রানা, গুলি হলে তাকে যেন না লাগে। তবে ও প্রায় নিশ্চিত যে লুইজির ওপর নির্দেশ আছে কোন রকম হৈ-হাঙ্গামা করা চলবে না।

দরজা খুলে গেল, সিঁড়ি বেয়ে নামছে ওরা। নিচে দোতলার বার দেখা যাচ্ছে, দরজা খোলা। উল্টোদিকে আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি, তিনতলা থেকে নেমে এসে একতলার ফ্লোরে পৌঁছেছে দোতলা ছুঁয়ে। ওদিক থেকে জুতোর শব্দ হলো, মুখ তুলতে লুইজিকে দেখতে পেল রানা, ধাপ বেয়ে সে-ও নামছে।

তাকে পাঁচ গজ পিছনে রেখে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গেটের কাছে কালো একটা মার্সিডিজ দেখা গেল, চীনা শোফার পোর্টারের সঙ্গে কি নিয়ে যেন তর্ক করছে। শীত কমে আসায় রাস্তায় লোকজনের ঢল নেমেছে। রাস্তা পার হয়ে পিছনে তাকাল রানা, কুমারী সুলক্ষণার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লুইজি, সামনে গাড়ির মিছিল থাকায় রাস্তা পেরুতে ইতস্তত করছে।

একটা বাঁক ঘুরল ওরা। বাতাসে প্রায় স্থির হয়ে আছে কুয়াশার ঢেউ, সাগর থেকে উঠে এসেছে। এদিকে যানবাহনের গতি মন্থর, হেডলাইট ও স্ট্রীটলাইটের আলো ঝাপসা। সাগরের কিনারা ধরে এগিয়েছে রাস্তাটা, শব্দদূষণ প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তার একদিকে সারি-সারি বার ও কাফে, ফুটপাথে ফেলা চেয়ারে বসে স্থানীয় আঁতেলরা রাজা-উজির মারছে, তারই সঙ্গে চলছে গ্লাসে বা কাপে চুমুক দেয়া। বারবার পিছনে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হলো লুইজিকে একবারও দেখতে পায়নি রানা। আলো ও ছায়ার ভেতর দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে পাশ কাটাল ওরা হোটেল ওয়েস্টমিনিস্টারকে, হলুদ ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে

টেরেসগুলো, ফুটপাথ-ঘেঁষে পাতা বাইরের টেবিলগুলোয় ভিড় জমিয়েছেন বয়োবৃদ্ধ অতিথিরা। আরও একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। লুইজিকে দেখল না, অথচ অনুভব করল ওদের ওপর কেউ নজর রাখছে।

হোটেল ওয়েস্ট এন্ড-এর সামনে থামল রানা, মেয়েটাকে ধরে নিজের দিকে ফেরাল। মেয়েটার মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে, চোখ দুটো সতর্ক। 'ধন্যবাদ আপনাকে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার...'

'মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা...'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখুনি ধন্যবাদ দিয়ো না। লুইজি এখনও ঝামেলা করতে পারে। ওদের মত লোক সহজে হাল ছাড়ে না।'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা, 'জানি। বিপদ থেকে এত সহজে আমার মুক্তি নেই।'

'তোমার পরিচয় কি?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। 'বাংলাদেশী অভিনেত্রী তনিমার সঙ্গে তোমার চেহারার এত মিল কেন?'

গভীর দৃষ্টি দিয়ে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটা, যেন রানার চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে মন ও মগজের তত্ত্ব-তালাশ নিচ্ছে। 'তারমানে আপনি একজন বাংলাদেশী,' ধীরে-ধীরে বলল সে। 'শুধু মিল বলছেন কেন, আমার চেহারা হুবহু তনিমার মত। তনিমা আমার দাদী, আমার বাবার মা। তবে যদি মনে করেন বংশগত কারণে আমি এই চেহারা পেয়েছি, তাহলে ভুল করবেন।'

'বুঝলাম না।'

'সে অনেক কথা, বলতে গেলে সারারাতেও কুলাবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'শুধু নামটা বলি—আমি ফিলিপা ডকিং।'

'আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলে তুমি!' চোখ বুলিয়ে চারদিকটা আবার দেখছে রানা। 'চলো, হোটেলে ঢুকে কিছু খাই। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

ওয়েস্ট এন্ড হোটেল পছন্দ করার অন্যতম কারণ, রানা জানে এখানে বার ছাড়াও বেশ বড় একটা কফি হাউসও আছে। ভেতরে প্রচুর লোকজন, বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট। ওয়েটারকে অনুরোধ করতে কামরার এক কোণে একটা টেবিল পাওয়া গেল। পাশেই একটা কাঁচ লাগানো জানালা, বাইরে রাস্তা দেখা যায়।

লুকিয়ে থাকার জন্যে ওয়েস্ট এন্ড-এর কফি হাউস আদর্শ জায়গা নয়। আসলে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে সরাসরি এখানে আসার পিছনে রানার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। ছুটি কাটাতে এসে আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নিতে রাজি নয় ও। মেয়েটা সম্পর্কে সব কথা জানতে হবে ওকে। জানতে হবে লুইজির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। কেউ একজন লুইজিকে ক্যাসিনোয় পাঠিয়েছিল, তার সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ওর। আর এ-সব জানতে হলে এমন এক জায়গায় থাকতে হবে, ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে কাউকে যেন হার্নিয়া বাধাবার ঝুঁকি নিতে না হয়।

আশপাশের টেবিল থেকে নারী-পুরুষ অনেকেই ফিলিপার দিকে তাকিয়ে আছে, অসম্ভব রূপসী আর বয়স খুব কম বলেই হয়তো। রানার ইচ্ছা হলো মেয়েটাকে ফুল কোর্স ডিনার খাইয়ে দেয়, কিন্তু তাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এই মুহূর্তে ফিলিপার আস্থা অর্জন করাটা জরুরী, তা নইলে ও মুখ খুলবে না। কাটলেট আর কফির অর্ডার দিল ও।

'রনা...রেনো...নাকি রনো...মিস্টার রনো, আমার কিন্তু...'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'সরি। মিস্টার রানা, আমার কিন্তু বেশি রাত করা উচিত হবে না। ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছি, সেটা একটা বিপদ। তারপর

আবার যদি ভিলায় ফিরতে দেরি করি, মহা...'

'চিন্তা কোরো না, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

তিক্ত এক চিলতে হাসি ফুটল ফিলিপার ঠোঁটে, কি যেন বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

কাটলেট শেষ করে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। 'ক্যাসিনোয় তোমার খেলার ধরন দেখে বুঝতে পারলাম রুলেত সম্পর্কে তোমার তেমন ধারণা নেই।'

'হ্যাঁ, আগে কখনও খেলিনি।'

'ওখানে তোমাকে দেখে আমি কিন্তু আরও একটা কারণে অবাক হয়েছি,' বলল রানা। 'তোমার সম্ভবত পনেরো চলছে, তাই না, অথচ নিয়ম হলো আঠারোর নিচে কাউকে খেলতে দেয়া যাবে না।'

হাসি পেলেও, সেটাকে চেপে রাখল ফিলিপা। 'এক বুড়ো দম্পতির পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ি আমি। গার্ডরা ধরে নেয় আমি ওঁদের নাতনী।'

'বেশিরভাগ মানুষ ওখানে মজা করতে যায়, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল ব্যাপারটাকে তুমি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ, যেন জিততে না পারলে বিরাট কোন ক্ষতি হয়ে যাবে।'

জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল ফিলিপা, হঠাৎ শিউরে উঠে বলল, 'মনে হলো লুইজিকে দেখলাম, রাস্তায় ঘুর ঘুর করছে।'

'আমি তো আছি, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বস্ত করল রানা।

'কি জানি, হয়তো ভুল দেখেছি,' বিড় বিড় করল ফিলিপা। জানালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'না, মিস্টার রানা, ক্যাসিনোয় আমি মজা করতে যাইনি।'

'তুমি সাড়ে ন'শো ফ্রাঙ্ক হেরেছ।'

'আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ করছিলেন।'

'সেজন্যে তোমার চেহারাই দায়ী,' বলল রানা। 'তাছাড়া,

জিততে না পারায় তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছিলাম।'

'হ্যাঁ, হেরে যাওয়ায় সত্যি আমি খুব হতাশ।'

'এখন তাহলে তোমার সম্বল মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, তাই না?'

ছোট্ট পার্সটা টেনে নিয়ে খুলল ফিলিপা। শেষ হলুদ চিপটা বের করে টেবিলে রাখল। 'হ্যাঁ, পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক,' ফিসফিস করে বলল। 'না, তাও নয়। এটা এখন স্রেফ একটা প্লাস্টিকের টুকরো।' গলাটা ধরে এল, কান্না চাপছে।

স্নেহ ও মমতা অনুভব করছে রানা, 'কেন ভাবছিলে জুয়ায় তোমাকে জিততেই হবে?' জানতে চাইল ও।

লজ্জায় নাকি ক্ষোভে বলা মুশকিল, মাথা নিচু করে বসে থাকল ফিলিপা। জবাব দিচ্ছে না।

'তোমাকে দেখে অভাবী ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় না,' সুর আরও নরম করে বলল রানা। 'চেহারাই বলে দিচ্ছে অন্তত খাবার কষ্ট তোমার নেই। দামী কাপড় পরে আছ, থাকোও একটা ভিলাতে। গাড়ি বা গহনা কেনার জন্যে জিততে হবে, এরকমও মনে হয়নি। আমি কোন লোভের গন্ধ পাইনি।'

'না, লোভ-টোভ কিছু নয়।'

'তবে খেলতে এসেছিলে মোটা টাকা জেতার আশায়। জেতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

'হ্যাঁ।' ফিলিপা মুখ তুলছে না।

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, ফিলিপা। তোমার সব কথা আমি শুনতে চাই। মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না, আমি হয়তো সত্যি তোমার উপকারে লাগব।'

চোখ তুলে রানার চেহারায় কি যেন খুঁজল ফিলিপা। 'ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না,' ধীরে ধীরে বলল সে, 'মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে আমার।'

'এরকম চরম মন্তব্যের পিছনে নিশ্চয়ই সঙ্গত কোন কারণ আছে। সেই গল্পটাই আমি শুনতে চাইছি, ফিলিপা।'

কথা না বলে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

'কি দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব আর নিষ্ঠা,' বলল ফিলিপা। 'বিপদ, নিষ্ঠুরতা আর সাহস।'

'আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল ফিলিপা। 'তা বোধহয় যায়।'

ওয়েটারকে ডেকে আবার কফি চাইল রানা। তারপর ফিলিপাকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, এবার তাহলে বলো।'

'জুয়ায় আমি জিততে চেয়েছিলাম, কারণ একজন লোককে আমার ভাড়া করতে হবে।' কিশোরীর নিষ্পাপ চোখে-মুখে সারল্য বাসা বেঁধে আছে।

ভুরু জোড়া প্রশ্নবোধক করে তুলে অপেক্ষা করছে রানা।

'তাকে বিশেষ একজন লোক হতে হবে,' আবার বলল ফিলিপা। 'তবে আমি ঠিক জানি না কত টাকা চাইবে সে। আপনি জানেন, মিস্টার রানা? সাধারণত কত টাকা লাগে? একজন খুনীকে ভাড়া করতে?'

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে হলুদ চিপটা তুলে নিল রানা। 'মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক,' বলল ও।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকল ফিলিপা, তারপর রেগে গেল। 'এটা ঠাট্টা করার মত কোন বিষয় নয়। আমি সিরিয়াস, মিস্টার রানা।'

'আমিও সিরিয়াস।' কিশোরী মেয়েটার ছেলেমানুষি দেখে হাসি পেলেও, সেটা কোনরকমে গোপন করে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল রানা। 'তুমি শুধু বলো কি কারণে কাকে খুন করতে হবে, তারপর দেখো...'

থমথম করছে চোখ-মুখ, মনে হলো এবার সত্যি-সত্যি কেঁদে

ফেলবে ফিলিপা। 'আপনি আসলে মনে-মনে হাসছেন, ভাবছেন আমি ছেলেমানুষি করছি...'

ওয়েটারকে আসতে দেখে চুপ করে গেল ফিলিপা। রানা লক্ষ করল, ওয়েটার কফির সঙ্গে বিলও নিয়ে এসেছে। লোকটা চলে যেতে ফিলিপাকে বলল, 'না, সত্যি হাসছি না, বিশ্বাস করো...'

রানাকে দ্বিতীয়বারের মত চমকে দিয়ে ফিলিপা বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে শুনুন। খুন করতে হবে... প্রথমে ডক্টর ল্যাজারাসকে, তারপর ডক্টর কবীর চৌধুরীকে।'

'কি বললে?' রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, ভাবছে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে শুনতে। 'আবার বলো।'

'আমি এমন একজন লোককে ভাড়া করতে চাই,' ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে বলল ফিলিপা, 'যে কিনা ডক্টর ল্যাজারাস আর ডক্টর কবীর চৌধুরীকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্যে সরিয়ে দেবে।'

কবীর চৌধুরী এখানে, ফ্রান্সের নিস-এ? মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। কে জানে আবার কি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে উন্মাদ লোকটা। 'কিন্তু কেন, ফিলিপা? ওরা তোমার কি এমন ক্ষতি করেছে যে ওদেরকে তুমি খুন করতে চাইছ?'

হঠাৎ ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। সহজ-সরল অসহায় একটা কিশোরী মেয়েকে এভাবে কাঁদতে দেখে রানার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। 'প্লীজ, ফিলিপা, শান্ত হও তুমি। আমি তো আছি...'

রানার বাড়ানো হাত থেকে সাদা রুমালটা নিয়ে চোখ মুছল ফিলিপা। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ওর কব্জি চেপে ধরল। 'আপনাকে কথা দিতে হবে, প্লীজ!' ধরা গলায় বলল সে। 'আপনি কিন্তু ওদের মত আমাকে পাগল ভাবতে পারবেন না।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে টেবিলের ওপর ঝুঁকে ওর ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল, ঠিক একটা ছোট্ট মেয়ের মত। 'আরও একটা কথা দিতে

হবে। যত যাই ঘটুক, বলুন আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? আমাকে আটকে রেখে আমার বাবাকে ব্ল্যাকমেইল করছে ওরা। পনেরো বিলিয়ন ডলার, মানে সোনা...' হঠাৎ থামল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, দৃষ্টি চলে গেছে রানাকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে।

পিছন ফিরে তাকাল রানা। প্রথমে দেখতে পেল লুইজিকে, চোখে-মুখে বিজয়ীর নগ্ন উল্লাস। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন দীর্ঘদেহী চীনা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো ড্রেসে মোড়া; বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্য, তির্যক দৃষ্টিতে দম্ভ। তাদের পাশে দু'জন সুন্দরী নার্সকে দেখা যাচ্ছে। এরপর হঠাৎ করেই দরজার কাছে উদয় হলো তিনজন পুলিস অফিসার, ইউনিফর্মে সাঁটা পদক আর ব্যাজ দেখে বোঝা গেল তাদের মধ্যে একজন অন্তত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। হোটেল ইস্ট এন্ড-এর ম্যানেজারকে চোখের দেখায় চেনে রানা, তিনিও নিজের তিনতলার অফিস কামরা থেকে নেমে এসেছেন। পুলিস কর্মকর্তার সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। হাবভাব দেখে মনে হলো কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা, যদিও এদিকেই তাকিয়ে আছেন।

চেয়ার ছাড়ার সময় ফিলিপার দিকে একবার তাকাল রানা। প্লেটে পড়ে থাকা বিলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে আছে পার্সটা। আবার যখন দরজার দিকে তাকাল রানা, দেখল ছোট্ট ভিড়টা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুবেশী এক লোক। তার পরনে দক্ষ দর্জির হাতে ছাঁটা ব্লু ব্লেইজার, গ্রে কেমব্রিজ স্ল্যাকস, প্যারিস ফ্যাশন কমপিটিশনের পুরস্কার পাওয়া ডিজাইনের শার্ট, একটা সিল্ক স্কার্ফ ও গুচি শূ।

'মশিয়ো ল্যাজারাস! আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?' এতটা দূর থেকেও পুলিস কর্মকর্তার ভারী গলা শুনতে পেল রানা। আগন্তুকের সঙ্গে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে করমর্দন করছেন।

একটা মিছিলের মত এগিয়ে এল ভিড়টা। মাঝখানে ডক্টর ল্যাজারাস, তার দু'পাশে পুলিস কর্মকর্তা ও ইস্ট এন্ড-এর ম্যানেজার।

ডক্টর ল্যাজারাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। তার চোখ দুটো বিশাল, সদা প্রস্তুত একজোড়া কালো ক্রীতদাস, নির্দেশ পাওয়ামাত্র মনের মন্দ অভিসন্ধিগুলো দ্রুত লুকিয়ে ফেলবে। ছোট মাথায় তেল চকচকে বাদামী চুল, সরু কপাল থেকে ঢেউ তুলে পিছন দিকে চলে গেছে। ঠোঁট জোড়া যেন সাইকেলের টায়ার, নাকটা বিশাল। শরীরটা লম্বা ও চওড়া, তবে শক্তি বা ক্ষিপ্রতার কোন আভাস নেই। অস্বাভাবিক বলতে হবে হাত দুটোকে, অসম্ভব লম্বা। দীর্ঘ তালু, সরু কাঠির মত আঙুল। লোকটাকে অশুভ আর অসুস্থ লাগছে রানার, সেজন্যে আসলে গায়ের হলদেটে রঙটাই দায়ী। এই লোক ব্ল্যাক আর্ট-এর চর্চা করে শুনলে একটুও অবাক হবে না ও। চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত একটা ভাব বড় বেশি দৃষ্টি কাড়ছে। তবে হাঁটার ভঙ্গি ও আচরণে মার্জিত আভিজাত্যের কোন অভাব নেই।

ব্যাপারটা ঘটল পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার সময়। দু'জোড়া চোখের মধ্যে যেন নীরব যুদ্ধ বেধে গেল। দৃষ্টি নামাতে রাজি নয় কেউ। ল্যাজারাস দগ্ধ করতে চাইছে, রানা বিদ্ধ। ল্যাজারাস চোখের ভাষায় সঙ্কেত দিল, আমি বুনো ওল; পাল্টা বার্তায় রানা জানাল, আমিও বাঘা তেঁতুল।

জীবনে চলার পথে এ-ধরনের লোক আগেও দেখেছে রানা। ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয় এমন কিছু কুৎসিত কাজে সাফল্য পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এরা, সেই সঙ্গে নিজ মেধার প্রতি আস্থা থেকে জন্ম নেয় নিশ্ছিদ্র দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাবোধ–যে-কোন পাল্টা আঘাত বা প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। রানা উপলব্ধি করল, ডক্টর ল্যাজারাস এমন একজন মানুষ, যার প্রকৃতি মিথ্যে ছাড়া আর কিছু চর্চা বা অনুমোদন করে না।

অশুভশক্তি চিরকালই দুর্বল, নীরব যুদ্ধে অবশেষে হেরে যাচ্ছে ল্যাজারাস। তবে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পরাজয়টাকে দক্ষতার সঙ্গে আড়াল করল সে।

দেখা গেল আশপাশের টেবিলে বসা লোকজন অনেকেই তাকে চেনে। তাদের ফিসফাস শোনা যাচ্ছে, 'ইনি ডক্টর লুথার ল্যাজারাস, বিখ্যাত সাইকিয়্যাট্রিস্ট!' বেশ কয়েকজন সসম্মানে চেয়ার ছাড়ল। পরাজিত দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার একটা অজুহাত পেয়ে গেল লোকটা, পিছিয়ে পড়ার সুযোগটাও হাতছাড়া করল না; এর-তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল পুলিস কর্মকর্তা ও হোটেলের ম্যানেজার। নিজের পরিচয় জানিয়ে পাসপোর্ট দেখাতে হলো রানাকে—মাসুদ রানা, বাংলাদেশী, একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কর্ণধার; প্যারিস হয়ে নিস-এ বেড়াতে এসেছে। পুলিস কর্মকর্তাও নিজের পরিচয় দিলেন, নিস পুলিস ডিপার্টমেন্টের প্রধান তিনি।

পুলিস প্রধান থামতেই ম্যানেজার শুরু করলেন, 'ডক্টর লুথার ল্যাজারাস একটা স্যানাটরিয়াম আর একটা প্রাইভেট হসপিটালের ডিরেক্টর। নিস-এ অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তিনি।'

'জ্যাক সিরাক-এর বাত সম্পর্কেও বলুন,' পুলিস প্রধান তাগাদা দিলেন, মুখে নির্লজ্জ হাসি। 'তবেই না ডক্টর ল্যাজারাসের কারিশমা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন উনি।'

'আমাদের প্রেসিডেন্ট জ্যাক সিরাক বাতে প্রায় পঙ্গুই হয়ে গিয়েছিলেন। ডক্টর ল্যাজারাস তাঁকে তেলে ভাজা ব্ল্যাক উইডো আর সাইকোথেরাপির সাহায্যে মাত্র এক হপ্তার মধ্যে পুরোপুরি সারিয়ে তুলেছেন। সেই থেকে গোটা ফ্রান্সে ডক্টর ল্যাজারাসের নাম ছড়িয়ে পড়ল...'

বাতের চিকিৎসায় সাইকোথেরাপি আর তেলে ভাজা বিষাক্ত মাকড়সা? হাসি পেলেও, গাম্ভীর্য বজায় রেখে রানা বাধা দিল, 'এ-

সব আমাকে শোনাবার মানে কি বলুন তো?' ইতিমধ্যে ও বুঝে ফেলেছে, প্রতিপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী, রণক্ষেত্রে হাজিরও হয়েছে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে পড়াটাই হবে উত্তম কৌশল; শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে চোরা-গুপ্তা হামলার সাহায্যে।

এই সময় পুলিস চীফ ও হোটেল ম্যানেজারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ল্যাজারাস। 'আহ্!' বিনয় ও শ্রদ্ধায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাথাটা। 'ভয় হচ্ছিল আমার রোগিণী আর তার উপকারী বন্ধুকে আমরা বোধহয় হারিয়েই ফেললাম। খুঁজে যখন পেয়েছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুমতি দিন, প্লীজ! ওহ্, সরি, মশিয়ো—আমি ডক্টর ল্যাজারাস, সাইকিয়্যাট্রিস্ট।'

তার বাড়ানো হাতে রানা কোন চাপ অনুভব করল না। 'মাসুদ রানা, ট্যুরিস্ট।' শক্তিতে যতটুকু কুলায়, সরু আঙুলগুলো পিষে দিল ও। স্থির হয়ে গেল লোকটা, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'কফি চলবে তো, ডক্টর ল্যাজারাস?'

'আমার রোগিণীকে প্রোটেকশন দিয়ে যে উপকার আপনি করেছেন,' ইঙ্গিতে ফিলিপাকে দেখিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলল ল্যাজারাস, 'তারপর আর ঋণ বাড়াতে চাই না...'

'মেয়েটা আপনার রোগিণী?'

'শুধু রোগিণী নয়, মশিয়ো, রীতিমত চ্যালেঞ্জিং একটা কেস।'

'আপনি বলছেন, ও একটা সাইকো?' রানা শান্ত, তবে প্রশ্নটার মধ্যে চ্যালেঞ্জের সুর স্পষ্ট।

'ব্যাপারটা আরও অনেক জটিল, মশিয়ো।' ল্যাজারাস হাত কচলাচ্ছে। 'আমাকে কথা বলতে হবে সাবধানে, ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক স্যাবটাজ না করে। এই রোগের হাইলি টেকনিক্যাল একটা নাম আছে, সেটা শুনে আপনার কাজ নেই। শুধু বলি, মেয়েটা মারাত্মক ইমোশনাল ডিসটারব্যান্স-এ ভুগছে।'

'এবং এই রোগের চিকিৎসা শারীরিক নির্যাতন?' জিজ্ঞেস

করল রানা।

'মশিয়ো!' ডক্টর ল্যাজারাস একাধারে আহত ও বিস্মিত হবার অভিনয়টা জমিয়ে তুলল।

'আপনার হুকুম না থাকলে ক্যাসিনোয় লুইজি ওকে ব্যথা দেয়ার সাহস পেত?' রানা লক্ষ করল, পুলিস প্রধান তাঁর দুই অফিসারের সঙ্গে ফিসফাস করছেন, তিনজনই চোরা চোখে দেখছে ওকে।

'আহ!' কি এক যন্ত্রণায় কাতর দেখাল ডক্টর ল্যাজারাসকে। 'ক্ষমা চাই, মশিয়ো, আমি ক্ষমা চাইছি। লুইজি আসলে আমার অভিশাপকে ভয় পায়। মেয়েটা ওর হাত থেকে পালিয়েছে তো, ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। কাজেই ও যদি বাড়াবাড়ি কিছু করে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব সব আমার। তাছাড়া, ও প্রফেশনাল নার্সও তো নয়, কাজেই ভুল-ত্রুটি করা স্বাভাবিক। এখন, মশিয়ো, আপনি যদি অনুমতি দেন, ওকে আমরা স্যানাটরিয়ামে ফিরিয়ে...

'আপনি তাহলে বলছেন, মেয়েটার ওপর কোন রকম নির্যাতন চালানো হয় না? আর কথাও দিচ্ছেন, পালিয়ে আসায় ওকে কোন রকম শাস্তিও দেয়া হবে না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এবং, মশিয়ো, আপনার উদ্বেগের প্রশংসা করি আমি।'

আর আমি তোমার নিকুচি করি, মনে মনে বলল রানা। 'আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আপনি ওকে সুস্থ করে তুলবেন।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, মশিয়ো। তবে ওই রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাই প্রয়োজন হয়।' লুইজি আর নার্স দু'জনের দিকে তাকাল ডক্টর ল্যাজারাস, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

ইঙ্গিত পেয়ে ফিলিপার দিকে এগোল ওরা। মেয়েটা টেবিলে কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে, চোখ দুটো বন্ধ। হঠাৎ করেই একজন নার্সের হাতে তরল ওষুধ ভর্তি একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ দেখা

গেল। দ্বিতীয় নার্স ও লুইজি ধরল ফিলিপাকে, প্রথম নার্স তার বাহুতে ছুঁচ ঢোকাল। শিউরে উঠে মুখ তুলল ফিলিপা, কি ঘটছে দেখল, কিন্তু কোন রকম বাধা না দিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ডক্টর ল্যাজারাসের দিকে।

'আমাকে চিনতে পারছ, ফিলিপা, মা-মণি?' একগাল হেসে, নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ডক্টর ল্যাজারাস। 'উঠে এসো, লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।'

দ্বিতীয়বার বলার দরকার হলো না, চেয়ার ছেড়ে যান্ত্রিক পুতুলের মত দরজার দিকে এগোল ফিলিপা। দুই নার্স, লুইজি ও চীনা লোকটা তার পিছু নিল। ইতিমধ্যে নিজের অফিসে ফিরে গেছেন হোটেলের ম্যানেজার। রানা দেখল, পুলিস অফিসাররাও দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'এত সুন্দর দেখতে...সত্যি দুঃখজনক।' মাথা নাড়ল রানা।

'ওর কথা আপনি ভুলে যান, মশিয়ো,' বলে ডক্টর ল্যাজারাসও এবার দরজার দিকে এগোল।

দ্রুত পা চালিয়ে তার সঙ্গেই থাকল রানা। 'চলুন, গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই আপনাদের।'

ডক্টর ল্যাজারাসের চোখ দুটো কঠিন হলো। 'মায়া বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই, মশিয়ো।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল কালো একটা মার্সিডিজ ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফিলিপাকে নিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরুবার পর এই গাড়িটাকেই দেখেছিল ও, পোর্টারের সঙ্গে চীনা ড্রাইভার কি নিয়ে যেন তর্ক করছিল।

চীনা লোকটা আগেই ড্রাইভিং সীটে বসেছে, তার পিছু নিয়ে লুইজি আর নার্সদের একজন সামনের দিকেই বসল। কিছু বলার দরকার হলো না, দম দেয়া পুতুলের মত ব্যাকসীটে উঠে বসল ফিলিপা। তার পিছু নিল দ্বিতীয় নার্স। ডক্টর ল্যাজারাস উল্টোদিকের দরজা দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চীনা ড্রাইভার

গাড়ি ছেড়ে দিল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লাইসেন্স প্লেটটা দেখল রানা। সামনের বাঁকটা ঘোরার আগে স্পীড কমল মার্সিডিজের। পিছনের উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও। মেয়েটার গালে পর পর কয়েকটা চড় মারল ডক্টর ল্যাজারাস। তারপর বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেল মার্সিডিজ।

থমথমে চেহারা নিয়ে কফি হাউসে ফিরে আসছে রানা। ওর জন্যে দরজার পাশে অপেক্ষা করছিল পুলিস অফিসাররা।

'মশিয়ো মাসুদ রানা,' পুলিস চীফ এগিয়ে এলেন। 'আমার একজন অফিসার আপনাকে চিনতে পেরেছেন। রানা এজেন্সির ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় হলো, এটা সত্যি গর্ব করার মত একটা বিষয়। আমাদের নিস শহরে আপনাকে স্বাগতম, মশিয়ো।'

'ধন্যবাদ।'

'অন্যভাবে নেবেন না, আমার একটা প্রশ্ন আছে, মশিয়ো,' বললেন পুলিস চীফ। 'রানা এজেন্সি তদন্ত করার লাইসেন্স পেয়েছে শুধু প্যারিসে, তাই না?'

রানার চোয়ালের হাড় শক্ত হলো। 'হ্যাঁ।'

'কথাটা এইজন্যে জিজ্ঞেস করলাম, নিসে আমরা কোন প্রাইভেট পুলিসকে কাজ করার অনুমতি দিই না। আপনাকে এ-ও জানানো দরকার বলে মনে করি, যে দু'একটা ফার্ম গোপনে এখানে কাজ শুরু করেছিল, তারা অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে।'

'কি রকম?'

'তারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, মশিয়ো। আসলে খুনগুলোকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে সাজানো হয়েছিল। যদি জিজ্ঞেস করেন, খুনগুলো কারা করল–দুঃখিত, মশিয়ো, এর জবাব আমাদের জানা নেই।'

'আপনাকেও একটা তথ্য দিই,' বলল রানা। 'নিসে কাজ

করার লাইসেন্স চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছে রানা এজেন্সি। আপনাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, আশা করছি দু'একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব ওটা।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কফি হাউসে ঢুকে পড়ল ও।

টেবিলে এসে বসল রানা। এক গাল হেসে এগিয়ে আসছিল ওয়েটার, হাত তুলে নিষেধ করল ও। এখন আর মুখে কিছু রুচবে না, কিছুক্ষণ একা বসে চিন্তা করতে চায়।

তিন মিনিট পর রানার চোখ পড়ল বিলটার ওপর। প্লেটটা সাদা, কাগজটাও তাই, অথচ লালচে একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। বিলটা তুলে উল্টোদিকে তাকাতেই লিপস্টিক দিয়ে মোটা হরফে লেখা শব্দগুলো যেন লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে। এ নিশ্চয়ই ফিলিপার কাজ। ইংরেজিতে সে যা লিখেছে তার বাংলা দাঁড়ায়–'ভিলা নার্সিসা। ক্যাপ ফেরাট। প্লীজ!'

তিন

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে ক্যাসিনোর দিকে যাচ্ছে রানা, টের পেল পিছনে ফেউ লেগেছে। মনে মনে হাসল ও, ভাবল, পুলিসও যখন কবির চৌধুরী আর ল্যাজারাসকে সাহায্য করছে, তখন কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ফেউটা পুলিসের ইনফর্মার হোক বা ডক্টর ল্যাজারাসের অনুচর, ভিলা নার্সিসা নিশ্চয়ই চিনবে।

ফিলিপা সম্পর্কে খুব অল্পই জানার সুযোগ হয়েছে রানার। তবে সে যে মানসিক রোগী নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও। কিন্তু

কোনরকম বাধা না দিয়ে শান্তভাবে ডক্টর ল্যাজারাসের কাছে চলে গেল, এর কি ব্যাখ্যা?

ফিলিপার এই আচরণ বিশ্লেষণ করতে রানার অন্তত কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পুলিস যে ডক্টর ল্যাজারাসের হাতের মুঠোয়, এটা ফিলিপা আগে থেকে জানে। সেজন্যেই পুলিস দেখেও তাদের সাহায্য চায়নি সে। আরেকটা কারণ, ফিলিপার বাবাকে আটকে রেখেছে ওরা। ওরা বলতে শুধু ডক্টর ল্যাজারাসকে বোঝায়নি সে, কবীর চৌধুরীকেও বুঝিয়েছে। ডক্টর ল্যাজারাসের সঙ্গে ভিলায় ফিরে যেতে অস্বীকার করলে বন্দী বাবাকে মেরে ফেলবে ওরা, তার মনে এই ভয় জাগা খুবই স্বাভাবিক।

তবে সবচেয়ে বড় কারণ, রানার ওপর বিশ্বাস। যেভাবেই হোক, তার ধারণা হয়েছে রানা তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।

অসহায় এক নাবালিকা বিপদে পড়েছে, সাহায্য তো রানা করবেই। সব মিলিয়ে ফিলিপা এখনও একটা রহস্য। রাত শেষ হবার আগেই সেই রহস্যের সমাধান করতে চায় রানা। পনেরো বিলিয়ন ডলারের সোনা সম্পর্কেও প্রবল আগ্রহ বোধ করছে ও। এরকম অবিশ্বাস্য মোটা টাকার সঙ্গে কবীর চৌধুরীর নামটা কিভাবে যেন মানিয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে এবার খুব বড় একটা দাঁও মারার তালে আছে সে।

একটা টয় অ্যান্ড অ্যান্টিকস শপে ঢুকে দরজার দিকে মুখ করা লম্বা আয়নায় চোখ রাখল রানা, লোকটাকে কাছ থেকে দেখতে চায়। এক মিনিট পর দরজার বাইরে দেখা গেল তাকে, একটু ইতস্তত করে পাশের জানালার সামনে দাঁড়াল, কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছে রানাকে।

লোকটা স্থানীয়, ফ্রেঞ্চ। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর কাপড়ের বেহাল অবস্থা দেখে মনে হলো বেকার ভবঘুরে। আসলে এটাই তার ছদ্মবেশ।

দোকানটা বেশ বড়। নিচু গলায় সেলসম্যানকে অর্ডার দিয়ে

দরজার দিকে এগোল রানা, ভাবটা যেন দোকান থেকে বেরিয়ে যাবে। দোরগোড়ায় থেমে উঁকি দিল, দেখল জানালার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কেউ।

'আপনার পিস্তল, মশিয়ো,' পিছন থেকে ডাকল সেলসম্যান।

ফিরে এসে খেলনা পিস্তলটা পকেটে ভরল রানা, দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। শার্টের কলারে আর শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে দুটো রেজার ব্লেড লুকানো থাকলেও, ভয় দেখাবার জন্যে ওগুলোর চেয়ে একটা খেলনা পিস্তল অনেক বেশি কাজের। ইতিমধ্যে হাতঘড়ির ছোট কাঁটা দশটার ঘরে পৌঁছে গেছে, এখন আর হোটেলে ফিরে ওয়ালথার বা ছুরি নিয়ে আসার সময় নেই। তাছাড়া, রানার ইচ্ছা নয় লোকটা ওর ঠিকানা জানুক।

দোকান থেকে বেরিয়ে একটা লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়াল রানা, পকেট হাতড়াবার ফাঁকে আড়চোখে দেখে নিল লোকটা ঠিক কোথায়। আরেকটা দোকানের শো-কেসের সামনে থেমে সিগারেট ফুঁকছে সে।

কফি হাউসের বিলটা বের করে লাইটপোস্টের আলোয় পড়ার চেষ্টা করছে রানা। একবার মুখ তুলে ডানে-বাঁয়ে তাকাল, চোখে-মুখে ট্যুরিস্টসুলভ অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা। ফুটপাথ ধরে প্রচুর লোক আসা-যাওয়া করছে, ওর প্রতি কারও কোন আগ্রহ নেই। হঠাৎ এক লোকের পথ আটকাল রানা। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, হাতের কাগজটায় চোখ রেখে, জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ ফেরাট কোনদিকে বলতে পারেন? ভিলা নার্সিসায় যাব আমি।'

'দুঃখিত, মশিয়ো,' বলে ওকে পাশ কাটাল পথিক।

অভিনেতা ট্যুরিস্ট হতাশ হলো না, দ্বিগুণ উৎসাহে আরেকজন পথিককে থামাল। ইনি একজন প্রৌঢ়া, এবং বদরাগী; প্রশ্ন শুনে জবাব দেয়া তো দূরের কথা, হাতের বন্ধ ছাতা তুলে মারতে এলেন।

তৃতীয় পথিক এক তরুণ। ক্যাপ ফেরাট ও ভিলা নার্সিসা

চেনে সে। ঘন-ঘন হাত নেড়ে পথ নির্দেশ দিচ্ছে, বিদেশী ট্যুরিস্টের উপকারে লাগতে পেরে খুব খুশি। কিন্তু মাঝপথে থেমে যেতে হলো, কারণ রানা তাকে বারবার বলছে, 'না, আপনি ভুল করছেন, ক্যাপ ফেরাট ওদিকে হবে কেন!' তরুণ যতই বোঝাবার চেষ্টা করে ক্যাপ ফেরাট ওদিকেই, রানা ততই ঘন ঘন মাথা নেড়ে তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

কৌতুকাভিনেতার ভূমিকায় নিজের অভিনয়ে রানা সন্তুষ্ট। ওর ছায়া এবং একমাত্র দর্শক প্রত্যাশিত আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে ওকে। শুধু লক্ষই করছে না, দু'পা এগিয়েও এসেছে।

'আপনার মাথায় নিশ্চয়ই ছিট আছে!' নিজের পথে রওনা হলো তরুণ পথিক, আপন মনে গজ গজ করছে, 'আমি যা-ই বলি, খালি মাথা নাড়ে...'

'আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?' টোপ গিলে এগিয়ে এল ফেউ।

'দেখুন না, ক্যাপ ফেরাট কোন দিকে জিজ্ঞেস করলে একেকজন একেকটা দিক দেখিয়ে দিচ্ছে। কফি হাউসের ওয়েটার বলল পশ্চিমে। ওই ছোকরা বলল উত্তরে। বলুন তো, আমি এখন কোনদিকে যাই?'

লোকটা হাসল। 'দু'জনের কেউই ভুল বলেনি। ক্যাপ ফেরাট আসলে উত্তর-পশ্চিমে। তা ওদিকে কোথায় যাবেন আপনি?'

'ওখানে একটা ভিলা আছে,' বলল রানা। 'ভিলা নার্সিসা। ওই ভিলায় আজ একবার আমাকে যেতেই হবে।'

'ক্যাপ ফেরাট এখান থেকে বেশ দূরের পথ,' বলল লোকটা। 'এলাকাটাও বিশেষ সুবিধের নয়। আপনার যাওয়াটা কি একান্ত প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে,' গলায় রাজ্যের উদ্বেগ ফুটিয়ে বলল রানা। 'ওখানে খুব বিপদে আছে এক...মানে, যেতে আমাকে হবেই। তা, ভাই, জায়গাটা আপনি চেনেন?'

'চিনব না কেন, আমার শ্বশুরবাড়ি তো ওদিকেই।' লোকটা ভুরু কুঁচকে ইতস্তত করছে। 'কিন্তু আমার জানামতে ভিলা নার্সিসা পরিত্যক্ত একটা বাড়ি, ওখানে কেউ থাকে না। খালি একটা বাড়িতে কেন আপনি যেতে চাইছেন?'

'বলেন কি, ওদিকে আপনার শ্বশুরবাড়ি!' স্বস্তির বিরাট একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। 'খালি নয়, খালি নয়, ভিলা নার্সিসায় একটা রাক্ষস বাস করে। সেই রাক্ষস এক রাজকন্যাকে ওখানে বন্দী করে রেখেছে। এ-সব বিপজ্জনক তথ্য, ভাই, আপনার না শোনাই ভাল। আপনি শুধু বলুন কোন পথ ধরে কতদূর যেতে হবে...'

'আপনি তাহলে যাবেনই?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বিদেশী মানুষ হয়ে অচেনা জায়গায় এত বড় ঝুঁকি নেবেন?'

'আরে ভাই, না গিয়ে পারা যাবে না। সে আমার পথ চেয়ে আছে যে! আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি বলুন...'

'বলার দরকার কি,' এতক্ষণে ক্ষীণ একটু হাসল লোকটা, 'আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি। চলুন, আপনাকে ভিলাটা দেখিয়ে দেব।'

লোকটার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! সত্যি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। আসুন, এই সামনেই একটা ক্যাসিনোর গ্যারেজে আমার গাড়ি আছে।' লোকটার কাঁধ ছাড়ছে না ও, তাকে নিয়ে রাস্তা পেরুল।

ক্যাসিনোর পোর্টার রানাকে দেখেই চিনতে পারল। সিত্রোঁ কনভার্টিবল আর চাবি ফিরিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বকশিশ পেল সে, স্যালুট করে আরেক দিকে চলে গেল।

প্রথমবার শুনেও না শোনার ভান করেছে রানা, কাজেই কথাটা দ্বিতীয়বার বলতে হলো লোকটাকে। 'মশিয়ো, আমাকে একটা ফোন করতে হবে। বাড়িতে স্ত্রী একা, ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখলে দুশ্চিন্তা করবে।'

'না-না, ঘরের বউকে দুশ্চিন্তায় রাখা ঠিক নয়,' বলে লোকটার একটা হাত ধরল রানা. খোলা তালুতে সিত্রোঁর চাবি রাখল। 'যে পথ চেনে তারই গাড়ি চালানো উচিত। নিন, উঠে পড়ুন।'

'কিন্তু ফোন?' লোকটার চোখে সংশয়।

ড্রাইভিং সীটের পাশে উঠে বসল রানা। 'রাস্তায় কি ফোন বুদের কোন অভাব আছে?' হাসল ও। 'এক জায়গায় থামলেই হবে।'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

দক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সে, কিন্তু রাস্তা ফাঁকা পেয়েও স্পীড বাড়াচ্ছে না। দুটো ফোন বুদকে পাশ কাটাল। আড়চোখে লক্ষ করছে রানাকে। তার মনের ইচ্ছাটা বুঝতে পারছে রানা। ও-ই গাড়ি থামিয়ে ফোন করতে যেতে বলবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে। আরও দুটো বুদকে পিছনে ফেলে এল ওরা। রানা চুপচাপ, শহরের আলোকসজ্জা উপভোগ করছে।

আরও দু'মিনিট পর মৃদু ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সিত্রোঁ। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, অদূরেই এক সারিতে কয়েকটা ফোন বুদ দেখা যাচ্ছে। 'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিছুই যেন জানে না।

'এক মিনিট লাগবে, মশিয়ো,' বলল লোকটা। 'ফোনটা করে আসি।' দরজা খুলে নামতে গেল সে।

'এমন বেআক্কেল তো দেখিনি!' হঠাৎ চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'তুমি কি আমাকে মারতে চাও?'

লোকটা হতভম্ব। 'মশিয়ো!'

'তোমাকে না তখন বললাম, আমার পিছনে পুলিস লেগেছে? তারপরও তুমি কোন আক্কেলে এভাবে পুলিস চীফের সামনে গাড়ি থামালে?'

'কই, কখন বললেন! তাছাড়া, এখানে আপনি পুলিস

দেখছেন কোথায়?' ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে শুধু বৃদ্ধ এক ভিখিরিকে দেখতে পেল লোকটা। বুড়ো করুণ সুরে বেহালা বাজাচ্ছে।

'এখন তো আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমিও ওদের দলে!' বলল রানা। 'ভেবেছ তোমরা আমাকে বোকা বানাতে পারবে? আমি শিওর, বেহালা হাতে ওই ভিখিরিটাই পুলিস চীফ।'

'মশিয়ো, আপনার মাথা ঠিক আছে তো?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'নাকি আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?'

'এটাকে কি বলে?' রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল।

স্থির হয়ে গেল লোকটা। ঝাড়া দশ সেকেন্ড নড়ল না। তারপর বলল, 'আপনাকে আমার ভয় লাগছে, মশিয়ো। কোন অপরাধ করে থাকলে ক্ষমা করুন। আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আমাকে এখানেই নেমে যেতে দিন।'

পিস্তলটা লোকটার পাঁজরে চেপে ধরল রানা। 'তিন সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি ছাড়ো। তা না হলে কলজে ফুটো করে দেব।'

ইঁদুরটা বুঝতে পারল, এতক্ষণ যাকে ভেড়া মনে হয়েছিল সে আসলে সিংহ। তিন সেকেন্ড পার হলো না, গাড়ি ছেড়ে দিল সে। হোটেল বিউ-রাভেজকে পিছিয়ে পড়তে দেখল রানা। বিশাল একটা বাঁক ঘুরল সিত্রোঁ, ঢালু রাস্তা ধরে হারবার-এর দিকে নামছে। খানিক পর পাহাড় কাটা কার্নিসে উঠে এল ওরা, পাশে, সরাসরি নিচে উত্তাল ভূমধ্যসাগর। এখান থেকে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে চওড়া রাস্তা।

'আমার কিছু প্রশ্ন আছে,' বলল রানা। 'তার আগে তোমাকে সার্চ করব।' কিন্তু সার্চ করে কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না, এমনকি একটা ছুরি বা ব্লেডও নেই। মানিব্যাগে অল্প কিছু টাকা আছে, কোন পরিচয়-পত্র নেই। 'তোমার নাম কি?'

'মিশেল বদিয়ের।'

'ডক্টর ল্যাজারাসের কাছে কত দিন আছ?'

'মশিয়ো, আপনার কোথাও মারাত্মক ভুল হয়েছে। আমি সাধারণ একজন বেকার মানুষ...'

'ও, তোমাকে সাবধান করা হয়নি বুঝি? একটাও যদি মিথ্যে কথা বলো, ভিলায় ঢোকার আগে তোমার লাশটা খাদে ফেলে দিয়ে যাব। আর সত্যি কথা বললে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে রেখে যাব। ভিলা থেকে যদি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারি, পিছু নেয়ার অপরাধে কড়ে আঙুলের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে ছেড়ে দেব। এখন ভেবে দেখো প্রাণ হারাতে চাও, নাকি কড়ে আঙুল?'

কথা না বলে ঢোক গিলল লোকটা।

'চুপ করে থাকলে চলবে না। কি চাও মুখ ফুটে বলতে হবে তোমাকে।' রানার চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত, কিন্তু চোখ দুটো নির্মম।

'আমি কড়ে আঙুল হারাতে চাই।'

'বদিয়ের, তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক হে!' রানা হাসছে না। 'এবার বলো, ডক্টর ল্যাজারাসকে তুমি কবে থেকে চেনো।'

'মশিয়ো, ডক্টর ল্যাজারাসের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে কখনোই আমার পরিচয় বা আলাপ হয়নি। কাজটা আমাকে লুইজি দিয়েছে।'

'কি কাজ?'

'স্যানাটরিয়াম থেকে কোন রোগী পালালে তাকে খুঁজে বের করা, কোন রোগী আত্মহত্যা করলে তার আত্মীয়-স্বজনদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা, এই সব কাজ। আমি একা নই, আমার মত আরও বিশ-বাইশ জন লোক খাটায় লুইজি।'

'এ পর্যন্ত ক'জন রোগী আত্মহত্যা করেছে?'

'আমার জানামতে গত ছ'মাসে সাতজন।'

'লাশগুলো কি আত্মীয়স্বজনকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বদিয়ের কথা বলছে না।

'বোঝা গেল, হয়নি,' বলল রানা। 'লাশ গোপন করার কাজটাও লুইজি তোমাদেরকে দিয়ে করায়, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না রানা। 'কিভাবে, বদিয়ের?'

'যখন যে ভিলায় রোগী আত্মহত্যা করে তখন সেই ভিলার পিছনের বাগানে লাশ পুঁতে ফেলি আমরা।'

'তুমি বলতে চাইছ ওরা স্যানাটরিয়ামে আত্মহত্যা করে না?'

মাথা নাড়ল বদিয়ের। হুড তোলা গাড়ি, প্রবল বাতাসে সোনালি চুল উড়ছে তার, তাসত্ত্বেও জুলফি বেয়ে ঘাম নেমে আসতে দেখল রানা। 'স্যানাটরিয়ামে আজ পর্যন্ত কেউ আত্মহত্যা করেছে বলে আমার জানা নেই, মশিয়ো। প্রতিটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে ডক্টর ল্যাজারাস তাকে ভিলায় নিয়ে আসার পর। নার্সিসার মত আরও কয়েকটা ভিলা আছে তার।'

'সবগুলোই মেয়ে?'

প্রশ্ন শুনে রানার দিকে একবার তাকাল বদিয়ের। শিউরে উঠল সে। তার জানা ছিল না মানুষের মুখ এমন কঠিন হতে পারে। 'জ্বী, মশিয়ো, সবগুলোই মেয়ে। প্রতিটি লাশ আমরা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পেয়েছি। ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলিনি, তবে সবাই জানি যে ডক্টর ল্যাজারাসের নির্যাতনেই মারা গেছে মেয়েগুলো। সেজন্যেই আমাদেরকে বলা হয় আত্মহত্যা করেছে, আর আত্মীয়স্বজনকে বলা হয় পালিয়েছে।'

'তোমরা যে কাজটা করো, তা তো খুন করার সমান অপরাধ। ভয় লাগে না? ধরা পড়লে?'

'লুইজি বলেছে, পুলিসকে নিয়মিত টাকা দেয়া হয়, তারা কোনদিনই আমাদেরকে কিছু বলবে না। শুধু টাকা নয়, স্যানাটরিয়াম থেকে অফিসারদের মেয়েও সাপ্লাই দেয়া হয়।'

'তোমাদের প্রেসিডেন্ট জ্যাক সিরাক কি সত্যি ডক্টর ল্যাজারাসের হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন?'

'সেই রকমই তো শুনি।'

'সাইকোথেরাপির সাহায্যে তাঁর বাতের চিকিৎসা করা হয়?'

'ওটা আসলে ডক্টর ল্যাজারাসের প্রচারণা,' বলল বদিয়ের। 'বাত ভাল হয়েছে মেডিসিনে। এই মেডিসিন তৈরি করে একজন চীনা, ইয়াং চু।'

'মেডিসিন মানে ব্ল্যাক উইডোর বিষ, তাই না?'

'বোধহয় তাই হবে। চুকে একবার আমি আমার মায়ের বাতের কথা বলেছিলাম। সে বলল, তেলে ভেজে মাকড়সা খাওয়ালে সেরে যাবে। আসলে ঠাট্টা করেছিল। দ্বিতীয়বার যখন মেডিসিন চাইলাম, বলল, সে তার গুরুর নির্দেশ ছাড়া কারও চিকিৎসা করে না।'

'তার আবার গুরুও আছে? কে সে, নাম কি?'

'ডক্টর ল্যাজারাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। আমি ভদ্রলোককে মাত্র একবার দেখেছি। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন, বিরাট শরীর।'

'কবীর চৌধুরী,' বিড়বিড় করল রানা।

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল বদিয়ের। 'মশিয়ো, আপনি তাঁকে চেনেন!'

রানা তার কথার জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এবার ভিল্লা নার্সিসা সম্পর্কে কি জানো খুলে বলো আমাকে। ভাল কথা, ভিলার গেট থেকে এক মাইল দূরে গাড়ি থামাবে তুমি।'

'মশিয়ো, আমার অঙ্গহানি না করলেই কি নয়? আমি তো সবরকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করছি আপনাকে।'

'তথ্যগুলো সঠিক কিনা যাচাই করে ভিলা থেকে বেরুই, তারপর তোমার কড়ে আঙুল সম্পর্কে বিবেচনা করব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল বদিয়ের, তারপর ভিলা নার্সিসার বর্ণনা দিতে শুরু করল।

বদিয়ের যেখানে গাড়ি থামাবে সেখান থেকে সোজা এক মাইল দূরে পাথরের পাঁচিল। তিন মিটার উঁচু ওটা, মাথায় ভাঙা

কাঁচ গাঁথা। গেট সাত মিটার উঁচু, মাথায় লোহার স্পাইক। শুধু এই ভিলা নার্সিসাতেই ডক্টর কবীর চৌধুরীর নিজের চারজন লোক পালা করে পাহারা দেয়, তিনি নিসে এলে এই ভিলাতেই ওঠেন কিনা।'

'ভিলাটার মালিক তাহলে কবীর চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, মশিয়ো। শুধু ভিলাটাই নয়, স্যানাটরিয়াম আর হসপিটালটাও তাঁর টাকায় তৈরি হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান–শতকরা ত্রিশজনই তো তাঁর দেশের লোক। বিরাট ইনভেস্টমেন্ট, তবে লাভও সেরকম। শুনেছি, তাঁর এই হসপিটাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের ভাইটাল পার্টস সাপ্লাই দেয়া হয়–বিশেষ করে কিডনি।'

'ভিলায় এখন কবীর চৌধুরী আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা আমি ঠিক বলতে পারব না, মশিয়ো।' মাথা নাড়ল বদিয়ের। 'গেটে আজ রাতে পাহারায় থাকার কথা শমসের আর ইউসুফের। ওদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল ছাড়াও পিস্তল আছে, মশিয়ো। কাজেই খুব সাবধান।'

'কুকুর নেই?'

'আগে ছিল। মাটি খুঁড়ে বাগান থেকে পচা লাশ বের করে ফেলায় ওগুলোকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।'

'পাঁচিল টপকে ভেতরে নামলাম,' বলল রানা। 'তারপর?'

'অন্ধকারে দেখা যায় না, তবে খানিক পরই কাঁটাতারের বেড়া আছে।'

'ইলেকট্রিফায়েড?'

'হ্যাঁ। আট ফুট উঁচু।'

'ওটা টপকাবার উপায় কি?'

'আশপাশে কোন গাছ নেই যে মগডাল থেকে লাফ দিয়ে টপকাবেন। তবে দু'মাস হলো বজ্রপাতে বেড়ার গোড়ার দিকে

খানিকটা তার পুড়ে গিয়েছিল, শেষ খবর জানি গত হপ্তা পর্যন্ত সেটা মেরামত করা হয়নি।'

'ফাঁকটা কি ভিলার সামনের দিকে?'

'পিছন দিকে, মশিয়ো। একমাত্র ওটা গলেই ভেতরে ঢুকতে পারবেন। তার কেটে লাভ নেই, অ্যালার্ম ফিট করা আছে।'

'বাকি দু'জন গার্ড কোথায় ঘুমায়?'

'ভিলার নিচে, বেইসমেন্টে।'

'ওরা চারজন ছাড়া ভিলায় আর কে থাকে?'

'ডক্টর ল্যাজারাস যখন ভিলায় থাকেন, তাঁর সঙ্গে আর থাকে ইয়াং চু আর লুইজি।'

আলোকিত একটা বাসকে সাইড দিল বদিয়ের। তারপরই সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল– 'সেইন্ট জাঁ-ক্যাপ ফেরাট'।

পাহাড়ের গা কেটে তৈরি এই দীর্ঘ কার্নিস বা হাইওয়ের নাম 'মোয়েনি করনিস'। রানার ডান দিয়ে ক্যাপ ফেরাট যেন প্রসারিত একটা মোটা আঙুল, ভূমধ্যসাগরে ঢুকে পড়েছে–এখানে সেখানে আলোর বিন্দু থাকায় আকৃতিটা স্পষ্ট। ঢালু হাইওয়ে ধরে দ্রুত নামছে সিত্রোঁ।

'আলো নেভাও,' নির্দেশ দিল রানা। হেডলাইট অফ করল বদিয়ের, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। বলতে হলো না, ব্রেক কষে গাড়ি থামাল বদিয়ের। 'অন্ধকারে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, মশিয়ো–খাদে পড়ে যাব।'

'বাকি পথটা আমি হেঁটে যাব,' বলল রানা। 'নিচে নামো।'

বদিয়ের নিচে নামতে তাকে দিয়ে পিছনের বনেট খুলিয়ে এক প্রস্থ নাইলন কর্ড বের করাল রানা। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে শুয়ে পড়তে বলল। বদিয়ের করুণ সুরে বলল, 'মশিয়ো, ওরা যদি জানতে পারে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি, স্রেফ জ্যান্ত কবর দেবে আমাকে...'

তার পা দুটোও এক করে বাঁধল রানা। বুট থেকে খানিকটা কালিঝুলি মাখা ন্যাকড়া বের করল, হাঁ করতে বলল বদিয়েরকে। 'শেষবার জিজ্ঞেস করছি, আমাকে ভুল কোন তথ্য দাওনি তো?'

চোখ পিট পিট করল বদিয়ের। 'ভুল তথ্য?'

আর কিছু না বলে বদিয়েরের মুখে ন্যাকড়াটা গুঁজে দিল রানা, তারপর রাস্তা থেকে তুলে বুটের ভেতর ফেলে ঢাকনি বন্ধ করল। গাড়ির ড্যাশবোর্ড হাতড়ে ছোট একটা টর্চ আর একজোড়া রাবার গ্লাভস পেল ও।

হাঁটা শুরু করে হাত দিয়ে ছুঁলো রানা, নিশ্চিত হয়ে নিল রেজর ব্লেডগুলো জায়গা মত আছে।

হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে 'প্রাইভেট' লেখা সাইনবোর্ডটাকে পাশ কাটাল রানা, এদিকটা এখনও অন্ধকার হলেও ভিলা মালিকের নিজস্ব রাস্তার শেষ মাথায় আলোর আভা দেখা যাচ্ছে–প্রায় মাইলখানেক দূরে।

দূরত্বটা পেরিয়ে এসে সামনে একটা বাঁক দেখল রানা। বাঁকটা উজ্জ্বল আলোর আভায় স্পষ্ট। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল রানা, তারপর ডালপালা সরিয়ে উঁকি দিল। দুশো গজ দূরে পাথরের দেয়াল ও গেট দেখা গেল। গেট হাউসের বাইরে একটা টুলে বসে রয়েছে একজন গার্ড, অটোমেটিক রাইফেলটা পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। লোকটার একটা হাত কানের কাছে তোলা–হয় মোবাইল ফোনে কথা বলছে, নয়তো খুদে রেডিওতে গান শুনছে।

রাতের আকাশে উদীয়মান সূর্যের মত গেটের মাথায় একটা ফ্লাডলাইট জ্বলছে, ফলে গেটের চারপাশ আর সামনের রাস্তা দুশো গজ পর্যন্ত দিনের মতই আলোকিত। গেট থেকে ভিলার দিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার।

বাঁক থেকে পেছিয়ে এল রানা, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরপথে পাঁচিলের দিকে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ থাকলেও ঘন

কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচিলের পাশে যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে আলোকিত গেটটা দেখা যায় না। তারপরও কান পেতে এক মিনিট অপেক্ষা করল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে পাঁচিলের মাথায় ছুঁড়ে দিল রানা, ভাঙা কাঁচগুলো ঢাকা পড়ে গেল। এরপর সোজা ওপর দিকে লাফ দিল। জ্যাকেট ঢাকা কাঁচগুলোর ফাঁকে হাত রেখে গতির মধ্যে কোন বিরতি না দিয়ে, পাঁচিলের মাথা টপকে পোলভল্ট-অ্যাথলেটের মত উল্টোদিকে নামল, নামার সময় টেনে নিল জ্যাকেটটা।

পাঁচিলের গোড়ায় কিছুক্ষণ গুঁড়ি মেরে বসে থাকল রানা। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও একটা ঝিঁ-ঝি পোকাও ডাকছে না। গেটে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী রেখে ভিলার ভেতর বীরত্ব দেখাতে যাওয়াটা নেহাত বোকামি হবে। তাই পাঁচিলের গা ঘেঁষে, মাথা নিচু করে, গেট হাউসের দিকে এগোচ্ছে রানা।

পাঁচিলটা ধনুকের মত বাঁকা। খুব সাবধানে এগোচ্ছে রানা। পাঁচিল থেকে ভিলার মূল ভবন অনেকটা দূরে, সিকি মাইলের কম নয়। ভবনের এক ও দোতলার কয়েকটা জানালায় আলো জ্বলছে। ওখানে পৌঁছাতে হলে অন্ধকার একটা মাঠ পেরুতে হবে ওকে। তার আগে টপকাতে হবে ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া।

পিছন দিক দিয়ে গেট হাউসে পৌঁছাল রানা। গেট হাউস বলতে ছোট একটা পাকা ঘর, সামনে ও পিছনে দরজা-জানালা সহ একটা করে সরু বারান্দা।

ভিলার দিকে মুখ করা বারান্দায় উঠে দরজা দিয়ে উঁকি দিল রানা। ভেতরে কোন ফার্নিচার নেই, দেয়ালের হুকে শুধু একটা ফোন ঝুলছে। দ্বিতীয় প্রহরী মেঝেতে বসে একটা কাগজের ওপর ঝুঁকে খসখস করে কি যেন লিখছে, পাশে একটা খাম পড়ে রয়েছে। অটোমেটিক রাইফেলটা নাগালের মধ্যেই রেখেছে

লোকটা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা খাপ, বড় আকৃতির ছোরার রূপালি হাতলটাই শুধু বেরিয়ে আছে। শার্ট ও জ্যাকেটের ভেতর শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে সে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা, হাতে খেলনা পিস্তল। চোখের কোণ দিয়ে ওর জুতোর ডগা দেখতে পেল লোকটা। কাগজের ওপর স্থির হয়ে গেল হাত ও কলম। নড়ল না, শুধু চোখ দুটো ধীরে ধীরে তুলল।

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে শব্দ করতে নিষেধ করল রানা, ইঙ্গিতে হোলস্টার আর খাপটা দেখাল।

কাগজের ওপর ঝুঁকে ছিল লোকটা, ধীরে ধীরে সিধে হয়ে বসল। কথা বলছে না, হোলস্টার থেকে ভারী পিস্তলটা বের করে মেঝেতে রাখল। এরপর খাপ থেকে টেনে নিল ছোরাটা, সেটাও রাখল পিস্তলের পাশে। দু'বারই মেঝেতে ইস্পাতের সামান্য ঘষা লাগায় মৃদু শব্দ হলো।

আঙুল নাচিয়ে লোকটাকে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল রানা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল লোকটা, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

লোকটার পিছনে দ্বিতীয় দরজায় দেখা গেল তার সঙ্গীকে। হাতে রাইফেল নয়, উদ্যত পিস্তল। সরাসরি রানার বুকে গুলি করল সে।

প্রথম লোকটা এক সেকেন্ড আগে দাঁড়াতে শুরু করায় তার চৌকো মাথাটা বুলেটের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। খুলিটা উড়ে গেল, ঝাঁকি খেয়ে রানার ওপর পড়ল লাশ। ঘরের ভেতর ঢুকে আরেকটা গুলি করল দ্বিতীয় গার্ড। ইতিমধ্যে এক পা পিছু হটে লাশের ধাক্কা সামলে নিয়েছে রানা। দ্বিতীয় বুলেট লাশের বাহু ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় প্রচণ্ড এক পাল্টা ধাক্কা দিয়ে লাশটাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও।

সঙ্গীর লাশ বুকে নিয়ে পিছন দিকে আছাড় খেলো দ্বিতীয় গার্ড, সরাসরি চৌকাঠের ওপর পড়ায় শিরদাঁড়ার একটা হাড়ে

ফাটল ধরল। পা দিয়ে লাশটাকে সরাল রানা, তার সঙ্গীর বুকে বসে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল গলাটা।

হাতের পিস্তল কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে, দশটা আঙুল দিয়ে গলাটা ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল লোকটা। খুন করা রানার ইচ্ছে নয়, লোকটা নিস্তেজ হয়ে আসছে দেখে ঢিল দিল হাতে, তারপর বুক থেকে নেমে পড়ল।

লোকটা চৌকাঠের ওপর পড়ে হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে। মেঝে থেকে পিস্তল দুটো তুলল রানা, একটা চালান করে দিল ট্রাউজারের পকেটে। ছোরা, খেলনা পিস্তল আর একটা রাইফেল নিয়ে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরুল, এক এক করে ওগুলো ছুঁড়ে দিল একটা ঝোপ লক্ষ্য করে; সবশেষে দ্বিতীয় রাইফেলটাও, দেয়ালে ঠেস দেয়া অবস্থায় এইমাত্র যেটা পেয়েছে।

ঘরে ফিরে এসে লোকটার পাঁজরে জোরসে দু'তিনটে লাথি মারল রানা। আরও মারত, চমকে উঠে থেমে গেল ক্রিং-ক্রিং করে ফোনটা বেজে ওঠায়।

'ওঠো, ফোন ধরো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা। 'বলবে শেয়াল দেখে ফাঁকা গুলি করেছ।'

লোকটা কোঁকাচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল। দেয়াল ধরে এগিয়ে এসে হুকে আটকানো ক্রেডল থেকে রিসিভার নামিয়ে বলল, 'কি?...আরে না, কয়েকটা শেয়াল বড় বিরক্ত করছিল, তাই...আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে দিল সে।

'কে ফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লুইজি।'

'তুমি কে? শমসের, নাকি ইউসুফ?' ফ্রেঞ্চ বাদ দিয়ে এবার বাংলায় প্রশ্ন করল রানা।

'তুমি বাঙালী?' হিসহিস করে উঠল লোকটা, দু'চোখে প্রচণ্ড আক্রোশ আর ঘৃণা। 'জানো কাদের সঙ্গে লাগতে এসেছ?'

রানা জবাব দিল না। বলল, 'তুমি আমাকে কাঁটাতারের বেড়া পার করে ভিলায় নিয়ে যাবে।' হাতের ভারী পিস্তলটা নাড়ল। 'বেরোও।'

লোকটা নড়ল না। 'বেড়ার ওপারে যেতে হলে ভিলায় ফোন করে কারেন্ট অফ করতে বলতে হবে। গেটটাও ইলেকট্রিফায়েড, কারেন্ট অফ করে ওদিক থেকে কেউ তালা খুললে তারপর ভেতরে ঢোকা যায়।'

'তোমাদের কাছে চাবি থাকে না?'

লোকটা মাথা নাড়ল।

'ভেতরে ঢোকার আর কোন উপায় নেই?'

মাথা নাড়ল লোকটা। কি এক প্রত্যাশায় চকচক করে উঠল তার চোখ দুটো।

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে বেড়ার তার বজ্রপাতে বেশ খানিকটা পুড়ে গেছে। এখনও ওটা মেরামত করা হয়নি।'

'এ খবর কে দিল তোমাকে!' লোকটার চোখে বিস্ময়ের পাশাপাশি এক ধরনের উল্লাস খেলা করছে।

'চলো, জায়গাটা দেখিয়ে দাও আমাকে।'

'চলো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল লোকটা, রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

লোকটার পিছু নিয়ে অন্ধকার মাঠে নেমে এল রানা। হাতের টর্চ মাঝেমধ্যে জ্বাললেও, আলোটা সরাসরি গার্ডের পিঠে ফেলছে, ভিলা থেকে কারও চোখে যাতে না পড়ে।

কংক্রিটের পিলারে নয়, খানিক পর পর মাটিতে পোঁতা লোহার রডে জড়িয়ে কাঁটাতার টানা হয়েছে। রডগুলো সবুজ, একই রঙ সরু তারগুলোরও, ফলে মাঠের ঘাসের সঙ্গে বেড়াটাকে আলাদাভাবে চিনতে পারা প্রায় অসম্ভব। দিনের বেলাও অনেকে ওই বেড়া দেখতে পাবে না।

বেড়াটা ধরে ভিলার পিছন দিকে চলে এল ওরা। এদিকে খোলা মাঠের জায়গায় আগাছা আর ঘন ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, হাত তুলে দেখাল, 'ওখান দিয়ে ঢোকা যায়।'

টর্চের আলোয় ভাঙা বেড়াটা পরীক্ষা করল রানা। বেড়ার নিচের দিকটা ঘন ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য। ফাঁকটার কিনারা ধরে তারগুলো সত্যি পোড়া বলেই মনে হলো, কালচে হয়ে আছে।

'তুমি যেই হও, আমার সঙ্গে তোমার কোন শত্রুতা নেই,' রানার সামনে থেকে বলল লোকটা। কথার সুরে ঘৃণা বা হিংস্র ভাব নেই এখন। পরিবর্তনটা বড় বেশি বাজল রানার কানে। 'কেউ যদি তোমার কোন ক্ষতি করে থাকে, তাকে তুমি যত খুশি শাস্তি দাও। কিন্তু দয়া করে আমাকে এ-সবের সঙ্গে জড়িয়ো না।'

'গুলিটা তুমি কাকে করেছিলে—আমাকে, নাকি তোমার বন্ধুকে?'

রানার দিকে পিছন ফিরে, অন্ধকার ভিলার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। ভিলার মাথায় পৌঁছে গেছে ঝাপসা চাঁদ, মাথার ওপর দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল সেদিকে। বেশ বড় বাদুড়ই হবে, ডানা ঝাপটাবার শব্দ বেশ অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল। লোকটা দেরি করে জবাব দিল, 'স্বীকার করছি ঝোঁকের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি। আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি।'

'ঠিক কি ধরনের দয়া আশা করো তুমি?'

'তুমি আমাকে মারো,' বলল লোকটা। 'মেরে অজ্ঞান করে রেখে যাও।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল রানা। 'এই ফাঁক গলে ভেতরে ঢোকার পর আর কোন বাধা নেই তো, সোজা ভিলার কাছে পৌঁছে যাব?'

'হ্যাঁ। আর কোন বাধা নেই।'

'গেট হাউসের বাকি দু'জন গার্ড এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভিলায় ঘুমাচ্ছে তারা, বেইসমেন্টে,' বলল লোকটা। 'আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে জানালার কাঁচ ভেঙে। একতলা বা দোতলায় শুধু লুইজি আর চু আছে। ডক্টর ল্যাজারাস এইমাত্র ডিনার সেরেছেন, এখন তাঁকে মেয়েটার ঘরে পেতে পারেন। আপনি যদি ওই মেয়েটার জন্যে এসে থাকেন, তাড়াতাড়ি করুন। ডক্টর ল্যাজারাসের মতিগতি আজ আমার বিশেষ সুবিধের মনে হয়নি।'

শুধু যে সম্বোধন বদলে গেছে, তা নয়, না চাইতেই আশীর্বাদের মত সমস্ত তথ্য উগরে দিচ্ছে লোকটা। 'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে ভিলায় যেতে চাইছ না?'

'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, স্যার!'

'তাতে আমার কি?' বলে দুই হাত দিয়ে লোকটার পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল রানা।

বেড়ার ফাঁক গলে ভেতরে পড়ল লোকটা, ঘন ঝোপের ভেতর ডুবে গেল সম্পূর্ণ। চার কি পাঁচ সেকেন্ড পর টিং-টিং করে দূরে কোথাও একটা বেল বাজল, তারপরই শোনা গেল পানিতে ভারী কিছু পতনের ছলাৎ শব্দ।

ফাঁকের নিচে মাটি নেই। একটা গভীর কুয়া আছে ওখানে, ঝোপগুলো যত্ন করে সাজিয়ে কুয়ার চওড়া মুখটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

টিং-টিং বেলের আওয়াজ গেট হাউসের দিক থেকে এসেছে। কুয়ার ভেতর নিশ্চয়ই তার আছে। এই তার শুধু গেট হাউসে নয়, ভিলাতেও হয়তো গেছে। ভিলায় বেল বেজে থাকলে নিশ্চয়ই কেউ খোঁজ নেবে কে পড়ল কুয়ায়।

কান পেতে অপেক্ষা করছে রানা। গেট হাউসটা খুব বেশি দূরে নয়, টেলিফোন বাজলে শুনতে পাবে ও।

পাঁচ মিনিট পর বজ্রে পোড়া তার পার হয়ে ঝোপ থেকে

আড়াই হাত লম্বা একটা ডাল ভাঙল রানা। সাবধানে পা ফেলে বেড়ার ফাঁকটার দিকে এগোল, মাটিতে ডাল ঠুকে ঠুকে বুঝতে চেষ্টা করছে কুয়ার মুখ ঠিক কত বড়।

কুয়ার কিনারায় হাঁটু মুড়ে বসল রানা, ঝোপ সরিয়ে টর্চের আলোটা নিচের দিকে তাক করল।

পঞ্চাশ কি ষাট ফুট নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে গার্ড, তার গায়ে কিলবিল করছে অসংখ্য কালো সাপ। শিউরে উঠল রানা। সিধে হয়ে লাফ দিল ও, কুয়া পেরিয়ে ঘাসের ওপর পা দিয়ে নামল।

দোতলা ভবনটা বিশাল। পুরোটা একবার চক্কর দিয়ে রানা আন্দাজ করল, সব মিলিয়ে ঘর হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা। ভবনের সামনে, গাড়ি-বারান্দায় সেই কালো মার্সিডিজটা দাঁড়িয়ে আছে, এঞ্জিনের ওপর ঢাকনিটা এখনও গরম।

ভবনের সামনে শুধু দোতলায় পাশাপাশি দুটো জানালায় আলো জ্বলছে। আলোকিত একতলার সব ক'টা জানালা ডান পাশে। প্রথম জানালায় কোন গরাদ নেই, শুধু একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা আধ ইঞ্চি সরিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। এটা একটা ছোট্ট কিচেন। কাঠের টেবিলে একা বসে চা খাচ্ছে ইয়াং চু, হাতে ধরা মগ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

ঘাসের ওপর নিঃশব্দে পা ফেলে আরেক জানালার নিচে এসে দাঁড়াল রানা। মাথাটা তুলল ধীরে ধীরে। এটা ছোট একটা কামরা, ফার্নিচার বলতে শুধু একটা কট। কটে শুয়ে রয়েছে লুইজি, মাথাটা দেয়ালে ঠেকে আছে, প্লেবয় ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে সে।

তৃতীয় জানালাটা বেশ খানিক দূরে। ওটার দিকে এগোবার সময় ডক্টর ল্যাজারাসের গলা পেল রানা। রীতিমত চিৎকার করছে সে।

'কেউ যদি কাউকে নতুন জীবন দান করে, তার কি কিছু

পাওনা হয় না? কিছু পাবার আশাতেই তো মানুষ মানুষের উপকার করে, নাকি? আমরা যে তোমাকে নতুন জীবন দান করেছি, এটা তো আর তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। অথচ বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কি পাচ্ছি আমরা? না, ফিলিপা, না! তোমার এই বেঈমানী আমি মেনে নেব না। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। আমি এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। নিজেকে স্বেচ্ছায় আমার হাতে তুলে দাও তুমি। যদি না দাও, আমার পাওনা আমি জোর করে কেড়ে নেব। এই আমার শেষ কথা।'

জানালার সরাসরি সামনে চলে এসেছে রানা। পুরোপুরি খোলা ওটা, ডক্টর ল্যাজারাসের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এটাতেও পর্দা আছে, তবে পুরোপুরি টানা নয়। এক কোণ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা।

ডক্টর ল্যাজারাস কাপড় পাল্টে স্লিপিং গাউন পরেছে। তার বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে কালো, লম্বা একটা সিগার জ্বলছে।

ফিলিপাকেও দেখতে পেল রানা। পরনে সেই একই ড্রেস, কামরার মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাত দুটো পিছনে, যেন অন্যায় করে শিক্ষকের তিরস্কার শুনছে কোন স্কুলছাত্রী। মাথাটা সামান্য নুয়ে আছে, ম্লান সবুজ রিবন দিয়ে চুলগুলো এখনও বাঁধা।

'ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগছে, তোমার কি কৃতজ্ঞতা বোধ বলতে কিছুই নেই? প্রতিদিন তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিই, তোমার অপেক্ষায় সারারাত জেগে থাকি আমি। কিন্তু কই, একদিন ভুলেও তো আমার দরজায় তুমি নক করলে না!'

ফিলিপা নড়ছে না। কথাও বলছে না। সে সরাসরি মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি ভায়োলেন্স পছন্দ করি না, ফিলিপা,' আবার শুরু করল ডক্টর ল্যাজারাস। 'তোমাকে মারধর করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তবে যদি বাধ্য করো, আর পাঁচটা মেয়ের মত তোমারও

হাড়গোড় গুঁড়ো করব আমি।'

'সেই ভাল,' নিচু গলায় বলল ফিলিপা। 'আমাকে আপনি মেরে ফেলুন।'

'নিজের পাওনা আদায় না করেই?' কুৎসিত হাসি ফুটল ডক্টর ল্যাজারাসের মুখে। 'না ফিলিপা, না–এত সহজে তুমি পার পাবে না। একবার যার ওপর লোভ হয় আমার, তাকে আমি ঠিকই পাই। তোমাকেও পাব, ফিলিপা, মাই ডার্লিং। আজ, এখনই...' হঠাৎ ছুটে এসে মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শয়তান লোকটা। ফিলিপা সরে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ডক্টর ল্যাজারাস এক হাতে ফিলিপাকে ধরে রাখল, অপর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ড্রেসটা ছিঁড়ে ফেলছে।

ব্যাপারটা প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেল। নিজেকে কোন রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল ফিলিপা, পরনে শুধু ব্রেসিয়ার আর প্যান্টি। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল না, পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ডক্টর ল্যাজারাস।

পিস্তলটা বেল্টে গুঁজে জানালার গোবরাট থেকে লাফ দিল রানা। ডক্টর ল্যাজারাসের পিছনে নামল ও, নেমেই এক হাতে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরল, অপর হাত দিয়ে পর পর কয়েকটা ঘুসি মারল পাঁজরে।

ছাড়া পেয়ে দরজার দিকে ছুটল ফিলিপা।

রানা অনুভব করল, ডক্টর ল্যাজারাসের পেশিতে ঢিল পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে সে।

দরজার কাছে পৌঁছে আঁতকে উঠল ফিলিপা, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পিস্তলটা ধরার জন্যে ঝট করে বেল্টে হাত দিল রানা।

'না, মশিয়ো!' দরজা থেকে বলল লুইজি, হাতের মান্ধাতা আমলের ট্রেজো সরাসরি রানার বুকে তাক করা। ক্ষতবিক্ষত সরু শেয়ালের মুখে নগ্ন উল্লাস দেখতে পেল রানা।

চার

পিস্তল দুটো হলে কি হবে, একটা বেল্টে গোঁজা, আরেকটা ট্রাউজারের পকেটে; বাধ্য হয়েই মাথার ওপর হাত তুলল রানা।

লুইজির হাতে মেক্সিকান ট্রেজো এক চুল নড়ছে না। 'ডক্টর ল্যাজারাস আমাদের শুধু অন্নদাতাই নন, এন্টারটেইনমেন্টেরও যোগানদার। তাঁকে অচল করে দিয়ে কাজটা তুমি ভাল করোনি।' ফিলিপার দিকে তাকাল সে। 'ছি-ছি, এত কম কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি কি আমার চরিত্র নষ্ট করতে চাও? তাড়াতাড়ি কাপড় পরো, তারপর চুকে ডেকে আনো। বলবে ডাক্তারের শুশ্রূষা দরকার।'

ওয়ার্ড্রোব খুলে নতুন এক সেট কাপড় বের করে পরছে ফিলিপা, তবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর উপস্থিতি এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

ইয়াং চুকে ডাকতে হলো না, নিজেই হাজির হলো। 'গেটের ওরা কেউ ফোন ধরছে না...' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল সে।

রানাকে দেখে ভেঙচি কাটল চীনা লোকটা। 'ডক্টর ল্যাজারাসকে বলব, তোমাকে যেন তিনি এন্টারটেইনমেন্টের জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দেন...'

'তার আগে বসের জ্ঞান ফেরাও,' খেঁকিয়ে উঠল লুইজি। 'যাও, খানিকটা পানি আর একটা তোয়ালে নিয়ে এসো।'

চোখে মুখে পানির ছিটা দিতে ডক্টর ল্যাজারাস নড়ে উঠল।

রানাকে লুইজি নির্দেশ দিল, 'দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়াও। চু, সার্চ করো ওকে।'

রানাকে সার্চ করে দুটো পিস্তলই বের করে নিল চু। এই প্রথম তার হাত দুটো লক্ষ করল রানা। দুই হাতেরই তর্জনী ও কড়ে আঙুলের নখ পাঁচ ইঞ্চি ছুরির ফলার মত বেরিয়ে আছে।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও,' রানাকে নির্দেশ দিল লুইজি। 'হাত মাথার পিছনে। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি, চু?'

'এই লোকটা গেটে নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটিয়ে এসেছে,' বলল চু। 'রাত বারোটায় ওদের রিপোর্ট করার কথা, না করায় আমিই ফোন করি। কেউ ধরছে না।'

'তুমিও কি আমাদের দলে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল লুইজি। 'এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবে মানুষ মারো?'

'গুলির শব্দ তো তোমরা শুনেছই,' বলল রানা। 'একজন আরেকজনকে গুলি করে মেরেছে। দ্বিতীয় লোকটা আমাকে কুয়ায় ফেলতে গিয়ে নিজেই পড়ে গেছে।'

'চু, নাদিম আর হাবিবকে ফোন করে বলো যে গেট খালি!'

'আমার মাথায় ঢুকছে না, এই ব্যাটা কোন্ বুদ্ধিতে ভিলায় ঢুকল,' বলল চু। 'ওকে কি সেক্স টেনে আনল? ফিলিপাকে দেখে ঘুরে গেছে মাথা?'

ভিজে তোয়ালেটা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে চোখ মেলল ডক্টর ল্যাজারাস। 'আমাকে ধরো, চু।'

বসের দুই বগলে হাত গলিয়ে টান দিল চু, সিধে হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল ডক্টর ল্যাজারাস। দেয়ালে কয়েক সেকেন্ড হেলান দিয়ে থাকল। 'আমাকে খানিকটা ব্র্যান্ডি এনে দাও, চু।'

দু'ঢোক ব্র্যান্ডি গিলে পাঁজরের হাড়গুলো টিপে পরীক্ষা করল ডক্টর ল্যাজারাস, তারপর মুখ তুলে বলল, 'তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, মশিয়ো রানা। তবে আপনার কথা ভেবে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে।'

'কি সেই দুঃখ একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন।'

'ছোটখাট হলেও আমাকে একটা বাহিনী পুষতে হয়, মশিয়ো। তাদের বেতন যেমন দিতে হয়, আনন্দ-ফুর্তির ব্যবস্থাও তেমনি এই আমাকেই করতে হয়। এই যেমন ধরুন, চু আর লুইজিকে শত্রু যোগাড় করে দিতে হয়। কেন? কারণ মানুষকে নির্যাতন করে মেরে ফেলাটাই ওদের এন্টারটেইনমেন্ট।'

'যেমন আপনার এন্টারটেইনমেন্ট কচি-কচি মেয়েকে ধরে এনে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি দিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করা, তাই না, বস্?' জিজ্ঞেস করল লুইজি।

'শাট আপ!' ধমক দিল ডক্টর ল্যাজারাস। 'আমি একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের সাধনা করা আমার জীবনের ব্রত। মেয়েদেরকে নিয়ে আমি যে এক্সপেরিমেন্ট করি তার সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তির কোন সম্পর্ক নেই। আমার সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত।'

'কথাগুলো মনে হচ্ছে কারও কাছ থেকে ধার করা,' বলল রানা। 'ঠিক এই কথাই আগেও আমি কোথাও শুনেছি।' কবীর চৌধুরীর নামটা ইচ্ছে করেই রানা মুখে আনছে না।

'বস্,' লুইজি বলল, 'এই লোক শমসের আর ইউসুফকে খুন করে ভিলায় ঢুকেছে।'

'হোয়াট!' হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল ডক্টর ল্যাজারাসের চেহারা। 'এ-সব কি শুনছি আমি! ওরা চৌধুরীর লোক, তিনি ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেবেন না।' ঝট করে ফিলিপার দিকে তাকাল। 'এর জন্যে তুমি দায়ী! না তুমি পালাও, না এত কিছু ঘটে। চু, গেট খালি নাকি?'

'না, ডক্টর ল্যাজারাস,' জবাব দিল চু। 'ব্র্যান্ডি আনতে গিয়ে হাবিব আর নাদিমকে ফোন করেছি। এতক্ষণে গেটে পৌঁছে গেছে ওরা...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ডক্টর ল্যাজারাস। আরও

দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে বলল, 'ডিসটার্ব কোরো না, আমাকে চিন্তা করতে দাও।' মাথার চুলে ঘন ঘন আঙুল চালাচ্ছে। ভয়ানক চিন্তিত দেখাল তাকে। কোন শব্দ না হলেও ঠোঁট জোড়া কাঁপছে একটু একটু।

রানার সন্দেহ হলো, ডক্টর ল্যাজারাস যমের মত বা তার চেয়েও বেশি ভয় পায় কবীর চৌধুরীকে। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও, বলল, 'আমি তাকে যতটুকু চিনি, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সে পছন্দ করে না।'

মুখ তুলল ডক্টর ল্যাজারাস। 'কার কথা বলছেন আপনি, মশিয়ো?'

'কবীর চৌধুরী তোমার লাম্পট্য সমর্থন করবে বলে মনে হয় না, ল্যাজারাস।'

'চু! লুইজি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডক্টর ল্যাজারাস। 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি! এখানে আমাদের আর থাকা চলে না। চু, সমস্ত জিনিস-পত্র সুটকেসে ভরে গাড়িতে তোলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিলা ছেড়ে চলে যাব আমরা।' এতক্ষণে রানার দিকে তাকাল সে। 'মশিয়ো, আপনার চোখে যেটা লাম্পট্য, আমার বন্ধু চৌধুরীর চোখে সেটা এক্সপেরিমেন্ট হলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তাই কি হবে?' রানাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল লুইজি।

'উতলা হয়ো না, লুইজি, উতলা হয়ো না,' উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল ডক্টর ল্যাজারাস। 'ছোট হলেও, আমি একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। চৌধুরী আমার বন্ধু ঠিকই, কিন্তু কোন কাজে খুঁত থাকলে তিনি খেপে যান।'

'বলছেন উতলা হয়ো না, কিন্তু ভাবছেন তো শুধু নিজের কথা,' অভিমানের সুরে বলল লুইজি। 'দয়া করে আমার কথাও একটু ভাবুন।'

'এবং আমার কথা,' ফোড়ন কাটল চু।

'মশিয়ো রানাকে বেইসমেন্টে নিয়ে যাও, লুইজি,' বলল ডক্টর ল্যাজারাস। 'শক্ত করে বাঁধবে। একা যেয়ো না, চুকেও সঙ্গে নাও। ফিরে এসে সুটকেস গোছাও। কাজটা শেষ করো, তারপর বলব ওকে নিয়ে কি করা হবে। আর, হ্যাঁ, নাদিম আর হাবিবকে ফোন করে বলে দাও, বিপদ; ভিলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা। যেভাবে পারে, ওরাও যেন ফিরে যায়...ওদের বসের কাছে।'

'মুভ!' রানার পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা মারল লুইজি।

রানা উফ করে উঠতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফিলিপা।

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। চু রানার পাঁচ হাত সামনে রয়েছে, রানার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে পিছু হটছে। লুইজি রয়েছে রানার পিছনে। দু'জনেই ওর নাগালের বাইরে।

করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়িটা। নিচে নেমে সারি সারি অনেকগুলো কামরা দেখল রানা। ছোট একটা ঘরে ঢোকানো হলো ওকে। ফার্নিচার বলতে একটা কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে, মেঝেতে রশির একটা কুণ্ডলী দেখা গেল।

'বসো, বীরপুরুষ,' নির্দেশ দিল লুইজি। চেয়ারের পিঠের সঙ্গে রানার হাত আর পায়ার সঙ্গে পা বাঁধতে এক মিনিটও লাগল না তার। 'তুমি এখন যেতে পারো, চু।'

রানাকে আরেকবার ভেংচি কেটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চু। এক সেকেন্ড পর দরজায় আবার তাকে দেখা গেল। 'তুমি শুধু শুধু মায়া বাড়াচ্ছ, লুইজি। মেলাতে পারলে অঙ্কটা পানির মত সোজা।'

'কি বলতে চাও তুমি?' লুইজির গলায় চ্যালেঞ্জের সুর।

'কিছুই বলতে চাই না, শুধু একটু মাথা খাটাতে বলি।' খিক খিক করে হাসল চু। 'আমি, শমসের আর ইউসুফ কার নেমক খাই ভেবে দেখো। এই লোক শমসের আর ইউসুফকে খুন করায়

ডক্টর ল্যাজারাস যে বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গেছেন, এ তো বোঝাই যাচ্ছে। এখন তাঁর উদ্ধার পাবার উপায় হলো, মিস্টার চৌধুরীকে খুশি করা।'

'মানে?'

'মিস্টার চৌধুরী কি খুশি হবেন না, যদি শোনেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত লোককে যে খুন করেছে সেই খুনীকে আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল?'

'কিন্তু সেই খুনীকে বন্দী করল কে?' পাল্টা যুক্তি দেখাল লুইজি। 'আমার এই কৃতিত্বের পুরস্কার ডক্টর ল্যাজারাস আমাকে দেবেন না?'

'হয়তো অন্য কোনও সময় দেবেন,' বলল চু। 'এবার বোধহয় আমার কপালেই শিকে ছিঁড়বে হে। ধরে নাও, ওকে আমিই পাচ্ছি!' চলে গেল চু।

'ওকে বিদায় করে দিলাম, কারণ তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে,' রানাকে বলল লুইজি। 'ডক্টর ল্যাজারাস বেশ একটু ঘাবড়ে গেছেন, এ-কথা সত্যি। আর ঘাবড়ে গেলেই উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বলা যায় না, উনি হয়তো মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মিস্টার চৌধুরী নির্দেশ দিলে উনি তোমাকে খুন না করার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। তোমাকে আমার বলার কথা হলো, যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোক, আমি ঠিকই এক সুযোগে নিচে এসে তোমাকে মেরে রেখে যাব। আরেকটা কথা, ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না। কারণটা বলতে পারব না, তবে কোন-কোন মানুষকে দেখলেই আমার খুন করতে ইচ্ছে করে। তুমি তাদেরই একজন। এটা স্রেফ আমার একটা নেশা। তুমি আমার কোন ক্ষতি করোনি, কিন্তু তবু আমার হাতেই তোমাকে মরতে হবে। মেনে নাও। এটাই তোমার নিয়তি।'

ও খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করছে, শেয়ালটাকে এটা ভাবতে দিলে কোন অসুবিধে নেই, সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'আমার

কাছে বস্তা-বস্তা টাকা আছে, লুইজি,' বলল ও। 'আমাকে ছেড়ে দাও, সব আমি তোমার হাতে তুলে দেব।'

'প্রিয় ঈশ্বর! তোমার বান্দার করুণ আর্তি কানে মধু বর্ষণ করে!'

'তুমি ধনী হয়ে যাবে, লুইজি,' বলল রানা। 'প্লীজ, ছেড়ে দাও আমাকে।'

খিক-খিক করে হেসে উঠল লুইজি। 'আসল কথা জানো না তো, তাই তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ। আরে বোকা, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দাঁও মারতে যাচ্ছি আমরা! এক-একজন এত বেশি পাব, টাকা দিয়ে নিস শহরটাকে মুড়ে ফেলতে পারব, তা জানো?' হাসতে হাসতেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। দরজায় তালা পড়ার ধাতব শব্দ ভেসে এল।

হাতের আঙুল নাড়তে শুরু করল রানা। বেল্টের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লুকানো রেজর ব্লেডটা হাতে চলে এল, রশির বাঁধনটা ধীরে ধীরে কাটছে রানা। হাত ও পা মুক্ত করতে পুরো এক মিনিটও লাগল না।

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলল রানা। ফরাসী দৈনিক, সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা পাতা। গোল পাকিয়ে ওটার আকৃতি বদলে ফেলল ও, দেখতে একটা নিরেট সিলিন্ডারের মত হলো। সিলিন্ডারটাকে মাঝখান থেকে দু'ভাঁজ করল—জিনিসটাকে এখন হাতল সহ ছোট একটা মুগুর বলা যেতে পারে, লোহার মতই শক্ত।

কাটা রশিগুলো কুড়িয়ে পায়ে আলগা ভাবে জড়াল রানা, হাত দুটো আগের মতই পাঠিয়ে দিল পিছনে, কাগজটা বাগিয়ে ধরে আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

সিঁড়ির পাথুরে ধাপে জুতোর শব্দ হলো। ক্লিক করে শব্দ তুলে খুলে গেল ঘরের তালা।

দরজাটা আস্তে করে খুলল লুইজি। তার শেয়াল-মুখ কালচে-নীলচে দেখাচ্ছে। উত্তেজনায় রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। 'লম্পট! বেজন্মা! মাদার–! শালার বুড়ো মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিল আমাকে। এখন বলছে, চু-র হাতে তুলে দেবে তোমাকে। কেন? না, চৌধুরীর লোক তোমার হাতে খুন হয়েছে, তাই চৌধুরীর লোকের হাতে তোমার মৃত্যু হওয়া চাই। জাহান্নামে যাক শালারা। চু তৈরি হয়ে নামার আগেই আমি আমার কাজ সেরে ফেলব।'

'না, লুইজি, প্লীজ!' বলল রানা।

'আল্লা আল্লা করো, হে; আল্লা আল্লা করো!' পরামর্শ দিল লুইজি। 'শেষবারের মত ক্ষমা চেয়ে নাও...' কাছে চলে আসছে লুইজি, হাতে উদ্যত পিস্তল।

কিছু বলতে যাচ্ছে, লুইজিকে এটা বোঝাবার জন্যে মুখ খুলল রানা, পরমুহূর্তে কাগজের মুগুরটা সামনে এনে প্রচণ্ড জোরে তার পিস্তল ধরা হাতে নিচের দিকটায় আঘাত করল। পাখির মত উড়াল দিল ট্রেজো, লুইজির কাঁধ টপকে পিছনের মেঝেতে পড়ে খটাখট-খটাখট আওয়াজ তুলল।

শেয়ালের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ঝুঁকল সে, এক হাতে চোট খাওয়া বাহু ডলছে, পিছু হটছে পিস্তলের দিকে।

লুইজি পিছু হটছে, রানাও সামনে বাড়ছে। কারও চোখে পলক নেই। জখমী বাহুটা এখন আর ডলছে না লুইজি। হাত দুটো পিছনে বাড়িয়ে দিয়েছে, নিচু করছে ওগুলো, পিস্তলটার নাগাল পাবার ইচ্ছা।

হঠাৎ মেঝেতে হাঁটু গাড়ল লুইজি, ডান হাত পিস্তল ছুঁয়ে দেবে। হাতটা পুরোপুরি লম্বা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর বিদ্যুৎবেগে মুগুরটা নামিয়ে আনল তার কনুইয়ের ওপর।

হাড় ভাঙার শব্দের সঙ্গে আহত পশুর গোঙানি শোনা গেল।

ওপরতলার কোথাও থেকে ডক্টর ল্যাজারাসের গলা ভেসে এল, 'লুইজি! কি মুশকিল, গেলে কোথায় ছাই!'

লুইজির মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে, তারপরও অক্ষত হাতটা দিয়ে পিস্তলটার নাগাল পেতে চেষ্টা করছে সে, কারণ জানে একমাত্র ওটাই তাকে বাঁচাতে পারে। আঙুলগুলো পিস্তলের বাঁট ছুঁলো, এই সময় পাকানো নিউজপ্রিন্ট দিয়ে তার নাকে-মুখে মারল রানা, নাকের নরম হাড় চুরমার হয়ে সেঁধিয়ে গেল ব্যাধিগ্রস্ত মগজে।

তার রক্তাক্ত মুখ থেকে গগনবিদারি একটা আর্তনাদ বিস্ফোরিত হলো। তারপর সে ঢলে পড়ল পিছনদিকে, কয়েক সেকেন্ড মোচড় ও ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

ঝুঁকল রানা, কাগজের অস্ত্রটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল, তারপর ডান হাত লম্বা করে পিস্তলটা তুলল।

সিধে হচ্ছে রানা, তখনই দেখতে পেল কালো কাপড়ে মোড়া একটা ছায়ামূর্তি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দুটো সোজা সামনের দিকে লম্বা করা, ছুরির ফলার মত চারটে আঙুলের নখ থেকে গাঢ় ও ঘন তরল পদার্থ ধীরগতি ফোঁটা হয়ে ঝরছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল চু। ফিস-ফিস করে দুটো শব্দ উচ্চারণ করল সে, শুনতে পেল না রানা, কিন্তু ঠোঁট নাড়া দেখেই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমে যেতে চাইল ওর।

'ল্যাট্রোডেকটাস ম্যাকটানস্!'

বিসিআই-এর সারভাইভাল ট্রেনিঙের কল্যাণে রানা বুঝে ফেলেছে লোকটার আঙুলের নখ থেকে কি ঝরছে।

ব্ল্যাক উইডো মাকড়সার ঘন করা বিষ।

পাঁচ

ব্যাপারটা পরিষ্কার। ভুল করার কোন অবকাশ নেই। হয় দ্রুত ও নিখুঁতভাবে চুকে খুন করতে হবে, তা না হলে ব্ল্যাক উইডোর বিষ রক্তে নিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে মরতে হবে ওকে। যে-সব প্রাণীর ভয়ঙ্কর বিষ আছে, ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা তাদের অন্যতম। এর বিষ প্রেয়ারীর একটা র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে পনেরোগুণ শক্তিশালী। তবে যেহেতু ঘন ও আঠালো করা হয়েছে, মৃত্যুযন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে। ফোঁটাগুলো যেভাবে অপচয় করা হচ্ছে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে অন্তত একহাজার মাকড়সা থেকে সংগ্রহ করা বিষ ব্যবহার করছে চু।

সে এমন সহজভাবে হেঁটে আসছে, রানার কাছে যেন কোন অস্ত্র নেই। সিঁড়ির ধাপে তার পা ফেলাটাকে কৌতুকাভিনেতার নৃত্য বলে অভিহিত করা যায়। তার পিছনে, সিঁড়ির মাথায়, ঠোঁটে মিটিমিটি অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডক্টর ল্যাজারাস। একবার বিদায়সূচক হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর দিকে সরে এল রানা, ফলে টেবিলটা এখন ওর আর চুর মাঝখানে থাকল। চুর মুখে কোন ভাব নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। গাঢ় চোখের মণি অচঞ্চল।

মেঝেতে শক্তভাবে পা ফেলে দাঁড়িয়েছে রানা। জানে, লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হওয়া চলবে না, প্রথমবারেই লাগাতে হবে গুলি।

লুইজির পিস্তল সম্পর্কে ওর ধারণা ভুল ছিল না—এটা মেক্সিকান ট্রেজো পয়েন্ট টু-টু মডেল ওয়ান। সিলেক্টরের সুইচ র‍্যাপিড ফায়ার-এ সেট করাই আছে।

রানা ট্রিগার টানলে একের পর এক বেরিয়ে আসবে আটটা বুলেট, ও চায় সবক'টাই যেন আত্মবিশ্বাসে ফুলে ওঠা চুর বুকে ঢোকে। মাথায় লক্ষ্যস্থির করলে, পিস্তল ঝাঁকি খাওয়ায় দু'একটা বুলেট পাশ কাটাবার সম্ভাবনা আছে। মাথার চেয়ে বুক অনেক বেশি চওড়া টার্গেট।

সিঁড়ির শেষ ধাপে, কামরার ঠিক বাইরে একটু থামল চু। ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকায় তার হাড়সর্বস্ব মুখ অস্পষ্ট লাগছে। তারপর কালো আস্তিনে মোড়া হাত দুটো হঠাৎ যেন নেচে উঠল, সেই সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে কামরার চৌকাঠে পৌঁছে গেল সে।

পিস্তলটা তুলল রানা।

একজোড়া ঈল মাছের মত বাতাসে মোচড় খাচ্ছে চুর দুই হাত, হঠাৎ দু'এক ফোঁটা বিষ কোনও নখের ডগা থেকে ঝরে পড়ছে নিচের মেঝেতে। কেয়ারই করছে না পিস্তলটাকে।

রানা অনুভব করল ওর মুঠোর ভেতর সন্দেহের দোলায় দুলছে পিস্তলটা। তবে ফায়ার ওপেন করার ঝোঁকটা ঠিকই সামলে নিল। চুকে ঘরের ভেতর চাইছে ও—আলোয়।

পেশিতে ঢিল দেয়ার জন্যে পিস্তলটা নিচু করল রানা। যেই নিচু করল অমনি চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল চু।

সময় নেই আর। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করারও সুযোগ নেই। নিতম্বের কাছ থেকে পিস্তল তুলেই ট্রিগার টেনে দিল রানা।

অটুট নিস্তব্ধতা বিকট বিস্ফোরণের মতই বাজল ওর কানে। কোনও আওয়াজ হলো না গুলির। হাসি ফুটল চুর মুখে।

লুইজির শখের অ্যান্টিকস পিস্তল জ্যাম হয়ে গেছে, অথবা গুলি বের করে নিয়েছে চু। সাঁই করে ছুড়ে মারল রানা ওটা চুর পাঁজর লক্ষ্য করে। কিন্তু নাচের ভঙ্গিতে সরে গেল চু বিদ্যুৎ-

বেগে, সোজা গিয়ে বাড়ি খেল ওটা উল্টোদিকের দেয়ালে।

টেবিলের ওদিকে দাঁড়িয়ে রানার চোখে নখ ঢোকাবার চেষ্টা করল চু। ঝট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা, বামহাতে ধরা কাগজের মুগুরটা দিয়ে বাড়ি মারল হাতে। লাগল না, হাত দুটো টেনে নিয়েছে চু।

টেবিল ঘুরে এগোল সে। রানা উল্টোদিকে ঘুরছে। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব একই থাকছে। ঘরের একপাশে চিত হয়ে পড়ে আছে নাক-ভাঙা শেয়াল।

কোন ব্যস্ততা বা অস্থিরতা নেই। পরস্পরকে অনুসরণ করছে যেন ওরা। মাঝে-মধ্যে চুর হাতের তেলতেলা নখগুলো নিক্ষিপ্ত বর্শার মত ছুটে এসে রানার চোখ খুঁজছে। কাগুজে অস্ত্রটা চালাচ্ছে রানা বাতাসে, কিন্তু লাগাতে পারছে না একবারও।

চুর প্রতিটি হামলার ডিজাইন ও গতি চোখে গেঁথে নিয়ে মগজকে দিয়ে হিসাব করিয়ে নিচ্ছে রানা। এটাকে হামলা না বলে নাচ বলাই ঠিক, প্রতিটি নড়াচড়া বা অঙ্গ সঞ্চালনের উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে সম্মোহিত করে ফেলা। চু আসলে এই মুহূর্তে রানাকে নিয়ে খেলছে। তার এখনকার ডিজাইন ও গতি বদলে যাবে ধীরে ধীরে, প্রতিবার রানার চোখের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবে তার বিষে তেজা নখ। এক সময় তার গতি এত দ্রুত হয়ে উঠবে যে চোখ দিয়ে রানা অনুসরণ করতে পারবে না। চুর হাতের অসহায় পুতুলে পরিণত হবে সে। যখন খুশি, যেখানে খুশি ওর শরীরে নখ ঢোকাতে পারবে চু।

যদি না তার আগে রানার হাতে মারা যায় সে।

চুর চিবুকে মুগুর চালাল রানা। ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল চু, অমনি বাঁ হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় টেবিলটা তার দিকে ঠেলে দিল ও। কোমরের হাড়ে লাগল টেবিলের কিনারা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল চু, কুঁজো হয়ে পিছাল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণে ফিরল আবার।

চুর দিকে এগোল রানা, টেবিলটাকে হড়কে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না চু।

তার বাঁ হাত হঠাৎ ছুটে এল রানার চোখ লক্ষ্য করে। মাথাটা পিছিয়ে আনল রানা, বুঝতে দেরি হয়ে গেছে ওটা ভান। চুর ডান হাত নেমে এল নিচের দিকে, জোড়া বিষাক্ত নখ টেবিল ধরে থাকা রানার হাতের কব্জিতে গাঁথবে। শেষ মুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে টেবিলটা পিছিয়ে আনল রানা। চুরও দেরি হয়ে গেল, তার কুড়ে আঙুল লক্ষ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে এল, তর্জনীর দীর্ঘ ও চোখা নখ ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল টেবিলের নরম টপে।

ডান হাতের মুগুর দিয়ে চুর মাথায় আঘাত করল রানা। সেটা এড়াবার জন্যে সবেগে ডান দিকে কাত হলো চু। রানাও সুযোগ বুঝে টেবিলটাকে গায়ের জোরে উল্টে দিল। মুট করে ভেঙে গেল নখ। ক্রোধ আর বিস্ময় মেশানো নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল চুর নাক-মুখ দিয়ে। ব্যথা পেয়েছে এবার।

টেবিলের মাথায় গেঁথে গেছে চার ইঞ্চি ভাঙা নখ, থরথর করে কাঁপছে সেটা।

আবার টেবিলটা তার দিকে হড়কে দিল রানা। এই টেবিলই তাকে সফল হতে দিচ্ছে না, কাজেই চু এবার তার কৌশল পরিবর্তন করল। বাঁ হাত দিয়ে রানার চোখের নাগাল পাবার চেষ্টা করল সে, ডান হাত দিয়ে কিনারা ধরে রানার শক্ত মুঠো থেকে টেবিলটা কেড়ে নিতে চাইছে।

দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর ভাঙা নখ, এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ গাঁথা নরম কেরোসিন কাঠে, খুদে বর্শার মত কাঁপছে সেটা–ডগা থেকে এবড়োখেবড়ো গোড়া পর্যন্ত মারাত্মক বিষে ভেজা।

কাগজের মুগুর দিয়ে দুটো বাড়ি মারতেই টেবিল ছেড়ে দিল চু। ধীর গতিতে কাঠের বর্মটাকে তার দিকে আবার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রানা। নাগালের মধ্যে আসতেই ডান হাত বাড়িয়ে টেবিলটা

আবার খপ করে ধরল চু। ওটা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হলো। চুর ডান হাত রানার মাথার নাগাল পেতে চাইছে বারবার। রানাও প্রতিবার এদিক-ওদিক সরিয়ে নিচ্ছে মাথাটা। তারপর হঠাৎ করেই রানার ভাঁজ করা হাঁটু মেঝেতে ঠেকল। নিচু হয়েই মাথা ও কাঁধের সাহায্যে টেবিলটা সবেগে ওপর দিকে তুলল। চুর ডান হাতের আরও একটা দীর্ঘ নখ মট করে ভেঙে গেল, আঠালো বিষ মেশানো নখটা মেঝেতে খসে পড়ল নিঃশব্দে।

বিস্ময়ের ধাক্কা তখনও সামলে উঠতে পারেনি চু; ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এবার, এই প্রথম, চুর সরু চোখে সংশয়ের ছায়া দেখতে পেল ও। তার ডান হাতের দুটো অস্ত্র পুরোপুরি ভোঁতা হয়ে গেছে।

টেবিলটা আরেকবার ধরল রানা। ওর এই চাল চু এখন শুধু চড়া মূল্য দিয়েই অগ্রাহ্য করতে পারে। বাঁ হাত লম্বা করে সে-ও আরেকবার টেবিলের নিচের দিকটা ধরল। এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা দুই ডুয়েল লড়িয়ের মত, দু'জনেরই সম্ভাব্য চাল মাত্র অল্প কয়েকটা, অথচ মৃত্যু অতি সন্নিকটে।

চুর দিকে এগোবার ঝোঁকটা দমিয়ে রাখছে রানা। তার আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে আসা ভয়ঙ্কর ছুরিগুলোর নিচে পৌঁছে কাগজের মুগুরটা ওর মুখে মারতে পারলে লড়াইয়ে জেতার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু তাতে ঝুঁকির মাত্রা বড় বেশি।

অপেক্ষায় থাকাটা রানার পোষাচ্ছে। চারটে নখের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে ওকে। শত্রুর হাতে অস্ত্র এখন মাত্র দুটো, তা-ও বাঁ হাতে। অপেক্ষার খেলায় ধৈর্য হারাল চু-ই প্রথম। টেবিলের ওপর দিয়ে নিক্ষিপ্ত বর্শার মত ছুটে আসতে চাইল সে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুগুর ফেলে, এক পাশে লাফিয়ে, দু'হাতে চুর কব্জি ধরে ফেলল রানা। তার জোড়া নখ গাঢ় ও চকচকে ফণার মত রানার মাংসের নাগাল পেতে চাইছে।

চুর সরু কাঠামো টেবিলের ওপর বিস্তৃত, মুখ নিচু করা। কব্জি থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে তার নগ্ন ঘাড়ে কনুই গাঁথল রানা। ছিঁড়ে গেল ঝিল্লি, থেঁতলে গেল মাংস, চিড় ধরল হাড়ে। একই সঙ্গে চুর কব্জি সহ হাতটা প্রচণ্ড শক্তিতে উল্টোদিকে মুচড়ে দিয়েছে রানা। হাঁ করল চু, নিঃশব্দে চিৎকার করছে।

চাপ কমাতে চুর হাতটা অসাড় ভঙ্গিতে টেবিলের কিনারা থেকে খসে পড়ল। ওখানেই পড়ে থাকল চু, হাঁপাচ্ছে, যন্ত্রণায় কুঁচকে থাকা চোখ দুটো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘৃণা।

পিছিয়ে এল রানা।

দু'জন একই সময়ে দেখতে পেল ওটা—কাঠের ওপর এখনও গাঁথা রয়েছে নখটা। রানা জানে একটা হাত অকেজো ও তীব্র ব্যথায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও নখটা ধরার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চু, ওটাকে সে তার সর্বশেষ হামলায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে।

অক্ষত হাতের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করল চু। বাম দিকে সরে এসে তার ঘাড়ে কারাতের একটা কোপ মারল রানা, দড়াম করে টেবিলে বাড়ি খেলো মুখটা, নাক ও কপালের হাড় ভেঙে গেল। রোমহর্ষক একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল চুর গলা থেকে। তারপর সে যখন হাঁটুর ওপর সিধে হলো, ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল রানা। পরের জন্যে কুয়া খুঁড়লে তাতে নিজেকেই পড়তে হয়, এটা সবসময় না হলেও মাঝে-মধ্যে নির্মম সত্যে পরিণত হয়। এখানে ঠিক তাই ঘটেছে।

ভাঙা নখটা এই মুহূর্তে চুর ডান চোখ থেকে বেরিয়ে আছে।

এখনও চিৎকার করছে চু, বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় খিঁচুনি উঠে গেছে শরীরে, গড়িয়ে টেবিল থেকে খসে পড়ল সেলের মেঝেতে।

তার এই মৃত্যু উপভোগ করার সময় নেই রানার। লুইজির লাশটা টপকে সেল থেকে বেরিয়ে এল। এবার ডক্টর ল্যাজারাসকে

ধরতে হবে।

দুটো করে ধাপ টপকে বেইসমেন্ট থেকে উঠে এল রানা। বাড়ির বাইরে থেকে ভেসে এল মার্সিডিজ এঞ্জিনের গর্জন। বিস্ফোরিত দরজা দিয়ে বেরুল ও। ড্রাইভওয়ের ধুলো ও কাঁকর পিছন দিকে উড়িয়ে ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ছুটছে মার্সিডিজ, দিক বদলে বাড়ির কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আগে অবশ্য সামনের সীটে ফিলিপাকে বসে থাকতে দেখেছে রানা, দুশ্চরিত্র ডক্টর ল্যাজারাসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে।

ছুটে ভিলার কোণে এসে রানা দেখল, রাস্তাটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে। মার্সিডিজের সামনে একটা লোহার গেট, গেটের মাথায় ফ্লাডলাইট জ্বলছে, দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া।

যত জোরেই দৌড়াক রানা, গেটে ওর আগে পৌঁছে যাবে মার্সিডিজ। ভিলার ভেতর থেকে সুইচ টিপে ফ্লাডলাইট জ্বালা হয়েছে, ধরে নেয়া চলে আরেকটা সুইচ টিপে কাঁটাতারের বেড়া আর গেটও বিদ্যুৎমুক্ত করা হয়েছে। তারপরও গেট খোলার জন্যে ডক্টর ল্যাজারাসকে গাড়ি থেকে একবার নামতে হবে। ততক্ষণে গেটের কাছে পৌঁছে যাবে রানা, শয়তানটার হাড়গোড় একটা একটা করে ভাঙবে।

ডক্টর ল্যাজারাসও তাই ভাবছে।

মার্সিডিজের প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে ছিটকে নিচে পড়ল ফিলিপা। ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করল ল্যাজারাস।

ফিলিপার দিকে ছুটছে রানা। মার্সিডিজের স্পীড বেড়ে গেল।

গেটটা ঢালের মাথায়। গাড়ি থামিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল ল্যাজারাস। ফ্লাডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হাতে গেটের তালা খুলছে সে।

ফিলিপার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা, মাথাটা তুলে নিল কোলের ওপর। কানে ঢুকল মার্সিডিজের গর্জন। গেট দিয়ে তীরবেগে

বেরিয়ে গেল সেটা। দ্বিতীয় গেটেও ল্যাজারাসকে থামতে হবে, তবে সেটা আরও প্রায় সাত-আটশো গজ দূরে।

ধীরে-ধীরে মেয়েটার জ্ঞান ফিরছে। এখনও চোখ খুলছে না, তবে হাত-পা নাড়ল, মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাল একবার।

আকাশের পুব দিকটা ফর্সা হয়ে আসতে দেখল রানা। ঘন কুয়াশা মিলিয়ে গেছে বাতাসে, সাগর থেকে উঠে আসা বাতাসে শীত-শীত করছে রানার।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল ফিলিপা।

'আর কোন ভয় নেই,' তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'ডক্টর ল্যাজারাস পালিয়েছে। কোনদিন আর ফিরেও আসবে না। তার লোকজনও তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।'

রানা অনুভব করল মেয়েটার পেশিতে ঢিল পড়ছে। কিছুক্ষণ আকাশ দেখল সে। তারপর কি যেন খুঁজল রানার মুখে। ঢোক গিলল, ঠোঁট কামড়াল, চোখ পিটপিট করল, কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর হাসল।

এরকম সরল ও পবিত্র হাসি জীবনে কখনও দেখেনি রানা। ওর মনে হলো, এত সুন্দর হাসি শুধু বোধহয় দেবশিশুরাই হাসতে পারে।

ছয়

বারান্দার ধাপে বসে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ওরা, ফিলিপাকে বসিয়ে রেখে রানাই বানিয়ে এনেছে। ফিলিপা প্রায়

কোন আঘাতই পায়নি, শুধু সামান্য চামড়া ছড়ে গেছে দুই কনুইয়ের।

রানা জিজ্ঞেস করেছিল ভিলায় ঢুকে বিশ্রাম নেবে কিনা, ফিলিপা রাজি হয়নি।

ভোরের আলোয় ভিলার চারপাশ খুব সুন্দর লাগছে। তিনদিকে ঢেউ খেলানো মেঘের মত দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষশোভিত পাহাড়শ্রেণী। তবে ভিলাটা অত্যন্ত প্রাচীন, আর ফিলিপার জন্যে অভিশপ্তও বটে।

ইতিমধ্যে তাকে রানা জানিয়েছে, লুইজি আর চু মারা গেছে। বেঁচে নেই শমসের আর ইউসুফও। তবে হাবিব ও নাদিম চলে গেছে। কোথায় গেছে রানার কোন ধারণা নেই। শুনে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ফিলিপা, যেন সে বলতে চায় অবশেষে যা ঘটার তাই তো ঘটেছে–অশুভশক্তি জিততে পারেনি।

কথা বলাবার জন্যে রানা কোন তাগাদা দিচ্ছে না। সময় হলে নিজেই বলবে সব। আপাতত ভোরের তাজা ও শীতল বাতাস থেকে সাগর ও ফুলের গন্ধ নিচ্ছে বুক ভরে, সদ্য পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে, পাশে বসা তার রক্ষকের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে।

ধাপের পাশে একটা পিলারে হেলান দিল ফিলিপা, কাঁধের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ সোনালি চুল। যখন সে মুখ খুলল, উচ্ছ্বসিত মনে হলো তাকে। 'ফ্রান্সের এই নিস শহর ভারি সুন্দর। শয়তান ল্যাজারাস আমাকে জিম্মি করে না রাখলে জায়গাটা সত্যি দারুণ উপভোগ করতাম আমি। ইচ্ছে করে, সে যখন পালিয়েছে, এখানে আরও ক'টা দিন থাকি। কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। আমাকে আরও অনেক কাজ করতে হবে। ল্যাজারাস পালিয়ে যাবার পর আমার কাঁধে বিরাট একটা দায়িত্ব চেপেছে। আপনার কি ধারণা, মিস্টার রানা? সে কি আবার ফিরে আসবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখানে? না, এখানে সে আর ফিরবে না।

তবে তারমানে এই নয় যে সে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে না। আসলে এদেরকে থামানো সহজ কাজ নয়।'

'তাহলে উপায়?'

'কঠিন পথটাই বেছে নিতে হবে, ফিলিপা,' বলল রানা। 'ওরা আমাদেরকে খুঁজে পাবার আগে আমরাই ওদেরকে খুঁজে বের করব। ওদেরকে থামাবার একটাই উপায়, গোড়া থেকে শিকড় কেটে ফেলা।'

নীল একটা শার্ট পরেছে ফিলিপা, ওপরের দিকে দু'তিনটে বোতাম খোলা। নিচে পরেছে রঙ চটা জিন্স।

হাঁটু দুটো ভাঁজ করে বুকের দিকে তুলল ফিলিপা, হাত দিয়ে জড়াল ওগুলো, মাথাটা নিচু করায় চোখের সামনে পর্দার মত ঝুলে থাকল সোনালি চুল। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আপনি নিজের পথে চলে যান, মিস্টার রানা। আপনি আমাকে ল্যাজারাসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমি এইটুকুই চেয়েছিলাম।'

'কথাটা ঠিক বললে না।' হাসিটা চেপে রাখল রানা। 'পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে তোমার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছিল, দু'জন লোককে খুন করতে হবে—ডক্টর ল্যাজারাস আর কবীর চৌধুরী। দু'জনের একজনকেও আমি এখনও খুন করতে পারিনি।'

'কিন্তু আমি কিছুতেই চাই না আপনিও আরেকজন লুইজি বা আরেকজন চু হয়ে ওঠেন—মানুষ খুন করে মজা পান। চুক্তিতে যাই থাক, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।'

'খুন করে কোনদিনই আমি মজা পাব না, ফিলিপা,' বলল রানা, গম্ভীর। 'তবে যাদেরকে খুন করা একান্ত দরকার তাদেরকে কোনদিন আমি ছেড়েও দেব না।'

'কিন্তু এটা তো আপনার কোন সমস্যা নয়,' বলল ফিলিপা। 'কোন্ অধিকারে আপনাকে আমি আমার বিপদের মধ্যে টেনে

আনব? তাছাড়া, আপনি কে তাইতো আমি জানি না।'

'সমস্যাটা এখন শুধু একা তোমার নয়,' বলল রানা। 'ডক্টর ল্যাজারাস কবীর চৌধুরীর বন্ধু বা কর্মচারী। আর কবীর চৌধুরী আমার পুরনো শত্রু। ওরা দু'জনেই এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। ইচ্ছে না থাকলেও ওদের সঙ্গে আমাকে লাগতেই হত, ফিলিপা।'

'কিন্তু কেন?'

'শুধু এইটুকু বলি—এটা আমার পেশা, দুষ্টের দমন।'

'আমি কি তাহলে ধরে নেব কাকতালীয়ভাবে একজন ডিটেকটিভ বা এসপিওনাজ এজেন্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে?'

'ধরে নিলে খুব বেশি ভুল করবে না,' বলল রানা। 'এবার বলো, ফিলিপা, তুমি আসলে কে? তোমার চেহারা বাংলাদেশী অভিনেত্রী তনিমার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে কেন? শয়তান ল্যাজারাসই বা তোমাকে বন্দী করল কি কারণে?'

'সে অনেক বড় গল্প,' বলল ফিলিপা। 'আমাকে বন্দী বা জিম্মি করল, কারণ মার্কিন সরকারের পনেরো বিলিয়ন ডলার চুরি করতে চায় ওরা।'

ফিলিপা ডকিং-এর গল্প শুনতে হলে আগে শুনতে হবে তার বাবা ফ্লয়িড ডকিং-এর গল্প।

ফ্লয়িড ডকিং-এর জন্ম বাংলাদেশে। তাঁর বাবা ডক্টর ফ্রেডারিক ডকিং ছিলেন একজন এনথলজিস্ট, রকফেলার ফাউন্ডেশনের একটা প্রজেক্টের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশে গবেষণা করতে এসে বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী তনিমা তাবাসসুমকে ভালবেসে বিয়ে করেন।

ছেলে ফ্লয়িড একটু বড় হতে তাকে ঢাকা থেকে নিজের কর্মক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন ডক্টর ফ্রেডারিক। কাজের

ফাঁকে সময় পেলেই তনিমা ঢাকা থেকে এসে স্বামী ও সন্তানকে দেখে যেতেন।

ফ্লয়িড বারো বছর বয়স পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে ছিলেন। সে সময় এক আদিবাসী বুড়োর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান তিনি। সুখলাল চাকমা দীর্ঘ চল্লিশ বছর কামরূপ কামাক্ষা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে আশ্চর্য সব জাদু শিখেছিলেন। ফ্লয়িডকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ছোটখাট বেশ কিছু জাদুও তাঁকে শিখিয়েছিলেন। বুড়ো সুখলাল ধাঁধা ও জটিলতা পছন্দ করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জটিল সব জিনিস তৈরি করতেন তিনি–এই যেমন, একটা বাক্সের ভেতর কয়েকটা বাক্স, কিন্তু কৌশলটা বলে না দিলে কারও পক্ষে সেগুলো আলাদা করা সম্ভব নয়। ওগুলো একটার ভেতর একটা ভরা এবং আলাদা করার পদ্ধতিটা অত্যন্ত জটিল, অথচ বলে দিলে সহজ। নির্দিষ্ট একটা জায়গা চেপে ধরে অন্য আরেকটা জায়গায় মৃদু টোকা দিলে বাক্সটা খুলে যাবে। কিন্তু কৌশলটা না জানলে খোলা প্রায় অসম্ভব।

এই সব কৌশল ও জটিলতা খুব আগ্রহের সঙ্গে শিখেছিলেন ফ্লয়িড ডকিং।

ফ্লয়িডের মা তনিমা তাবাসসুম ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসার পথে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান, ফ্লয়িডের বয়স তখন মাত্র এগারো। এর এক বছর পর বাবার সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে যান ফ্লয়িড।

আমেরিকায় এসেও ধাঁধা ও জটিল কৌশল নিয়ে চর্চাটা ছাড়েননি ফ্লয়িড। এক সময় তালার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মাল। কী লক হোক বা কমবিনেশন লক, তালা দেখলেই সেটা তাঁর পরীক্ষা করা চাই। কলেজে ভর্তি হয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়লেন ফ্লয়িড, এবং পড়া শেষ করে এমন একটা ফার্মে চাকরি নিলেন যারা বিভিন্ন ব্যাংকের সিকিউরিটি সিস্টেমের ডিজাইন তৈরি করে।

ফ্লয়িড ডকিং-এর জন্যে এটাই ছিল আদর্শ ও উপযুক্ত কাজ।

চাকরিতে শুরু থেকেই ভাল করলেন ফ্লয়িড, মালিক পক্ষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই বলাবলি করতে লাগল, ছেলেটা জাদু জানে, তা না হলে এতসব নতুন ধরনের সিকিউরিটি সিস্টেমের ডিজাইন তৈরি করা তার দ্বারা সম্ভব হত না। তার খ্যাতি রটে গেলে অন্যান্য কোম্পানি থেকে ডাক এল, কিন্তু সে-সব ডাকে সাড়া না দিয়ে ফ্লয়িড নিজেই একটা কোম্পানি খুলে বসলেন। ইতিমধ্যে তাঁর যে খ্যাতি ছড়িয়েছে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে যে কোম্পানি খোলার কিছু দিনের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের জন্যে মার্কিন সরকার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

সবাই জানে আমেরিকার প্রায় সব সোনাই ফোর্ট নক্স-এ থাকে। কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সোনা রয়েছে ম্যানহাটনের নাসাউ স্ট্রীটে, ফেডারেল রিজার্ভ-এর আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে—সব মিলিয়ে চোদ্দ হাজার টন। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই ভল্ট আপডেট করা হবে, সেজন্যেই ফ্লয়িডকে তাদের দরকার।

ফ্লয়িড ডকিং ফেডারেল রিজার্ভ-এর ভল্টসহ গোটা সিকিউরিটি সিস্টেম নতুন করে ঢেলে সাজালেন। সিকিউরিটির কোয়ালিটি বজায় রাখার জন্যে সরকার তাঁকে ফেডারেল রিজার্ভ-এর চীফ কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দিল। চুরি ও ডাকাতি ঠেকাতে আধুনিক প্রযুক্তি যখন যেটা বাজারে পাওয়া যায়, কিনে এনে প্রয়োগ করেন ফ্লয়িড। সশস্ত্র প্রহরী হিসেবে কাকে নিয়োগ করা হবে, তাও নির্ধারণ করে দেন তিনি। মোট কথা, ফেডারেল রিজার্ভ-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সরকার তাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে, সেই ক্ষমতা তিনি পুরোপুরি ব্যবহারও করেন। নতুন করে ঢেলে সাজানো তাঁর সিকিউরিটি সিস্টেম যে নিখুঁত, সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল পরবর্তী আঠারো বছরে। এই আঠারো বছরে ফেডারেল রিজার্ভ-এর সোনা নব্বুইবার চুরি আর

এগারোবার ডাকাতি করার চেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু চোর বা ডাকাতদের দুর্ভাগ্য যে কিছুই তারা নিয়ে যেতে পারেনি। সেজন্যেই বলা হয়, ফেডারেল রিজার্ভের সিকিউরিটি সিস্টেমের ডিজাইনটা ফ্লয়িড ডকিং-এর তৈরি একটা মাস্টারপীস।

ফ্লয়িড এক সময় পঞ্চাশে পা দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। আপনজন বলতে শুধু একটা মেয়ে, ফিলিপা ডকিং, বয়স চোদ্দ।

ফিলিপা তার চোদ্দতম জন্মদিনে আবদার করল, এবার গরমের ছুটিতে বাবার জন্মস্থান বাংলাদেশ দেখতে যাবে সে, সেই সঙ্গে দাদী তনিমার অভিনীত সিনেমাগুলো ক্যাসেটে রেকর্ড করে নিয়ে আসবে। একটাই মাত্র মেয়ে, তার আবদার ফ্লয়িড অগ্রাহ্য করেন কিভাবে। তাছাড়া, এতবছর পর নিজের জন্মস্থান দেখার লোভটা তাঁকেও পেয়ে বসল। সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশে গেলে বান্দরবানেও একবার যাবেন। চিরকুমার বৃদ্ধ সুখলাল চাকমা নিশ্চয়ই আজ আর বেঁচে নেই, তবে তাঁর স্মৃতি আজও ফ্লয়িডের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাংলাদেশে এসে ঢাকায় দু'হপ্তা থাকল ওরা। ফ্লয়িড ডকিং ফেডারেল রিজার্ভ-এর চীফ কনসালট্যান্ট, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ; কাজেই বাংলাদেশে তাঁর আগমন সংবাদ মিডিয়াতে স্থান পেল।

ঢাকায় খুব ব্যস্ত সময় কাটল ফিলিপার। তনিমা অভিনীত পুরানো সিনেমা থেকে বেছে বেছে বেশ কয়েকটা ক্যাসেটবন্দী করল সে। দাদীর ফটো আগেই সে দেখেছে, তবে সচল ছায়াছবিতে আরও সুন্দর তিনি। ফিলিপা নিজেও দেখতে খারাপ নয়, তবে দাদীর রূপ দেখে তার মনে হলো—আহা, আমি যদি ওঁর মত সুন্দরী হতাম!

ভাগ্যবিধাতা তার মনের এই আকাঙ্ক্ষা বড় অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর পরিহাসের মাধ্যমে পূরণ করলেন।

ঢাকা থেকে মেয়েকে নিয়ে বান্দরবানে বেড়াতে এলেন

ফ্লয়িড। চিরকুমার বৃদ্ধ সুখলাল চাকমা অনেক বছর হলো মারা গেছেন, তবে মারা যাবার আগে গ্রামের হেডম্যানের কাছে প্রিয় ও স্নেহভাজন ফ্লয়িডের জন্যে একটা বিশেষ উপহার রেখে গেছেন তিনি। সেটা একটা জাদুর বাক্স, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। হেডম্যান জানালেন, সুখলালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জীবনে অন্তত একটিবার হলেও ফ্লয়িড বান্দরবানে অবশ্যই আবার আসবেন।

বান্দরবানের ওই আদিবাসী গ্রামে পনেরো দিন বেড়াবার ইচ্ছা ছিল ফ্লয়িডের। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এমন একটা ঘটনা ঘটল, সময়ের আগে শুধু বান্দরবান নয়, বাংলাদেশই ত্যাগ করে চলে যেতে হলো তাদেরকে। চলে যেতে হলো চোখের পানি ফেলতে ফেলতে।

ঢাকা থেকে ভাড়া করা একটা ল্যান্ডরোভার নিয়ে বান্দরবানে এসেছিলেন ফ্লয়িড। গ্রামে আসার পর থেকে রোজ সকালে ওই জীপ নিয়ে একা বেরিয়ে পড়ত ফিলিপা, উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা ধরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে-ফিরে আসত।

বান্দরবানে আসার পঞ্চম দিনেও খুব ভোরে জীপ নিয়ে বেরুল ফিলিপা। ফেরার পথে ঢালু রাস্তার ওপর মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করল সে।

সামনের ট্রাকটাকে ঘন কুয়াশার মধ্যে আগে থেকে দেখতে পায়নি ফিলিপা। জীপের হেডলাইট জ্বললেও, ট্রাকের হেডলাইট অফ করা ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রাকটাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করে ফিলিপা। মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেল জীপ। কিন্তু প্রচণ্ড ঝাঁকিটা সামলে ওঠারও সময় পেল না ফিলিপা, পিছন থেকে অন্য একটা ট্রাক ফুল স্পীডে এসে আঘাত করল জীপকে।

দুটো ট্রাকের মাঝখানে পড়ে প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল জীপ। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ফিলিপা।

জ্ঞান হারাবার পর কি ঘটেছিল ফিলিপার তা জানার কথা

নয়। দুই ট্রাক থেকে দু'জন লোককে নেমে আসতে দেখেনি সে, দেখেনি তাদের একজন জীপে এমনভাবে আগুন ধরাল যাতে শরীরের অন্য কোন অংশ না পুড়ে শুধু তার মুখটা পোড়ে, আরেকজন সেই পোড়া মুখে হড়হড় করে ঢেলে দিল এক বোতল অ্যাসিড।

কাঠুরেদের মুখ থেকে খবর শুনে ফ্লয়িড যখন অকুস্থলে পৌঁছালেন ট্রাক দুটো তখন চলে গেছে, জীপের আগুনও নিভে গেছে, শুধু তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে জনশূন্য পাহাড়ী এলাকার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করছে ফিলিপার আর্তচিৎকার।

স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুধু মরফিন ইঞ্জেকশন দেয়া হয় ফিলিপাকে, স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শে সেদিনই মেয়েকে নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসেন ফ্লয়িড। হাসপাতালের ডাক্তাররা ফিলিপাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। ফিলিপার মুখ দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁদের। আগুনে পোড়া মুখ আগেও তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু এরকমটি আগে কখনও দেখেননি বা শোনেননি। ফিলিপার মুখের মাংস ক্ষয়ে গেছে, সারা মুখে অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'শুধু আগুনে পুড়লে এ অবস্থা হতে পারে না।'

ফিলিপার মুখের ক্ষত শুকাবার চিকিৎসা শুরু হয়েছে, কিন্তু ফ্লয়িড চান দেরি না করে প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মেয়ের মুখ মেরামত করতে। আগের মত সুন্দর না হোক, এই ক্ষতবিক্ষত কুৎসিত চেহারার বদলে অন্যরকম কিছু একটা অবশ্যই পেতে হবে ফিলিপাকে, যা দেখে মানুষ ভয়ে আঁতকে উঠবে না। বাংলাদেশে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারি সম্ভব নয়, এটা বুঝতে পেরে সিঙ্গাপুরে ফ্যাক্স করলেন তিনি। ওখান থেকে উড়ন্ত একটা হসপিটাল চলে এল চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে। মেয়েকে নিয়ে প্লেনে উঠতে যাবেন, এই সময় ডক্টর লুথার ল্যাজারাস নামে এক লোক তাঁর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাইল। ডিপারচার লাউঞ্জের নির্জন

কোণে দাঁড়িয়ে ডক্টর ল্যাজারাস জানাল, সে একজন সাইকিয়্যাট্রিস্ট হলেও, দীর্ঘদিন চর্চা করে শল্য চিকিৎসাতেও হাত পাকিয়েছে—এ-ব্যাপারে তার গুরু হলেন ডক্টর কবীর চৌধুরী। তো খবরের কাগজে রিপোর্ট পড়ে ডক্টর কবীর চৌধুরীর ধারণা হয়েছে, ফিলিপার মুখ শুধু আগুনে পোড়েনি, অ্যাসিডে খেয়েও ফেলেছে। এই অ্যাসিড হয়তো ট্রাক দুটোর যে-কোন একটায় ছিল। সে যাই হোক, ডক্টর কবীর চৌধুরী মিস্টার ফ্লয়িড ডকিংকে জানাতে চান, আগুন ও অ্যাসিডে পোড়া মুখ মেরামত করবে এমন চিকিৎসা দুনিয়ার কোথাও এখনও আবিস্কৃত হয়নি, শুধুমাত্র একা তাঁর পক্ষেই গ্যারান্টি সহকারে এর চিকিৎসা করা সম্ভব। ডক্টর ল্যাজারাস জানাল, ডক্টর কবীর চৌধুরীকে দিয়ে চিকিৎসা করালে ফিলিপাকে তিনি আগের চেয়েও সুন্দর মুখ উপহার দেবেন।

মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে ফোন করে ফ্লয়িড জানতে পারলেন, রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের মধ্যে কবীর চৌধুরী নামে কেউ নেই। ডক্টর ল্যাজারাস সম্পর্কেও কোন তথ্য পাওয়া গেল না। বৃথা তর্কের মধ্যে না গিয়ে ডক্টর ল্যাজারাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে।

পরবর্তী ছটা মাস বাপ ও মেয়ের জীবন দুঃস্বপ্ন, কান্না আর ব্যর্থতার সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল। মেয়েকে নিয়ে গোটা উন্নত বিশ্ব চষে ফেললেন ফ্লয়িড, কিন্তু অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিও তাদেরকে এই আশ্বাস দিতে পারল না যে ফিলিপাকে সুন্দর না হোক, স্বাভাবিক একটা চেহারা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব।

এক সময় বাপ ও মেয়েকে বাস্তবতার মুখোমুখি হতেই হলো। ফিলিপা চিরকাল কুৎসিত হয়েই থাকবে, এই উপলব্ধি পাগল করে তুলল ফ্লয়িডকে। রাতে তিনি ঘুমাতে পারেন না, মেয়ের ঘরের বাইরে পায়চারি করেন আর কাঁদেন। ইতিমধ্যে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে দু'বার, আর একবার ব্লেড দিয়ে হাতের রগ কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে ও। অল্পের জন্যে বাঁচানো গেছে

ফিলিপাকে, ফ্রয়িডের ভয়, পরেরবার হয়তো আর তা সম্ভব হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও, এ-জীবন রাখবে না কিছুতেই। চোখে অন্ধকার দেখছেন ফ্রয়িড। ভাবছেন, ডক্টর ল্যাজারাসের কথায় রাজি না হয়ে মস্ত ভুল করেছেন।

ঠিক এই সময় তাদের নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে আবার হাজির হলো সেই ডক্টর ল্যাজারাস। এবার একা আসেনি সে, সঙ্গে আছে ডক্টর কবীর চৌধুরীও।

কবীর চৌধুরীকে দেখে, প্রথম দর্শনেই প্রভাবিত হলেন ফ্রয়িড। প্রকাণ্ড শরীর, পরনে দামী কাপড়ের কমপ্লিট সুট, চোখে সানগ্লাস, মাথায় হ্যাট, চলনে-বলনে গুরু-গম্ভীর আভিজাত্য। ফ্রয়িড কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ মিথ্যে গর্ব করবেন বলে বিশ্বাস হয় না। যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই কবীর চৌধুরী কয়েকটা সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখাল তাঁকে, তারপর আগুন ও অ্যাসিডে পোড়ার পর কি অবস্থা হয়েছে তাদের সে-ছবি দেখাল ফ্রয়িডকে। ফটোতে ফ্রয়িড দেখলেন মুখগুলো ফিলিপার চেয়েও বেশি কুৎসিত ও ক্ষতবিক্ষত। এবার চিকিৎসা পরবর্তী ফটোগুলোও তাকে দেখাল কবীর চৌধুরী। প্রতিটি বীভৎস চেহারা আনকোরা নতুন ও সুন্দর হয়ে গেছে। ফ্রয়িড মুগ্ধ তো হলেনই, সেই সঙ্গে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কবীর চৌধুরীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে মিনতি করলেন তিনি, 'আপনি যা চাইবেন তাই দেব, দয়া করে শুধু ফিলিপার মুখটা সুন্দর করে দিন।'

'আমি আপনার এই উপকারটা করব বলেই তো এসেছি,' অমায়িক হেসে বলল কবীর চৌধুরী। 'তবে বিনিময়ে আমিও আপনার কাছে কিছু একটা উপকার চাইব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন ফ্রয়িড। 'আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।'

ধীরে-ধীরে ব্যাখ্যা করল কবীর চৌধুরী কি সে চায়। ফিলিপার

জন্যে সুন্দর একটা মুখের বিনিময়ে ফেডারেল রিজার্ভের ভল্টে নিজের লোক ঢোকাবার সুযোগ করে দিতে হবে তাকে।

ব্যাপারটা উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য। শুধু একটা পাগল এ-ধরনের প্রস্তাব দিতে পারে, এ-প্রস্তাবে রাজি হওয়াও শুধু একজন পাগলের পক্ষেই সম্ভব। তবে তার মানে এই নয় যে ফ্লয়িড ডকিং আর কবীর চৌধুরী একই জাতের পাগল। ফ্লয়িড পাগল হয়ে থাকলে মেয়ের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে পাগল বানিয়েছে। সন্তানের জন্যে মা-বাবা কি না করতে পারে। ফ্লয়িড ডকিং-এর পাগলামিকে মাত্রা ছাড়ানো ভালবাসা ছাড়া আর কিইবা বলা যায়।

তবে মেয়ের চেহারা ও প্রাণের বিনিময়ে খুব চড়া মূল্য দিতে হবে ফ্লয়িডকে। সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, একটা মাস্টারপীস ধ্বংস করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাঁকে।

তাঁর ডিজাইন করা ওই ভল্টের দেয়াল রিইনফোর্সড স্ট্রাকচারাল কংক্রিট দিয়ে তৈরি। ওটা নাসাউ স্ট্রীটের আশি ফুট নিচে। বাইরের দিকে অনেক গেট আছে, প্রতিটি জটিল ডাবল-কী লকিং সিস্টেম সহ। তবে সরাসরি একেবারে ভল্টে ঢুকতে হলে সরু একটা প্যাসেজ ধরে যেতে হবে, যেটা নয় ফুট উঁচু নব্বই টন ওজনের সলিড স্টীল সিলিন্ডার কেটে তৈরি করা হয়েছে। একশো চল্লিশ টন ওজনের একটা ফ্রেমে বসানো সিলিন্ডারটাকে এদিক-ওদিক নড়ানো যায়। প্রবেশপথ বন্ধ করার জন্যে সিলিন্ডার ততক্ষণ ঘোরে যতক্ষণ না ওটার সাইডগুলো নিরেট ইস্পাত দিয়ে ফ্রেমটাকে পূরণ করে বা খাপে খাপে মিলে যায়—তারপর ওটা খসে পড়ে; এক ইঞ্চির আটভাগের তিন ভাগ—বোতলের বিশাল এক ছিপির মত। ওটা এয়ারটাইট, ওয়াটারটাইট, এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয় টাইম ক্লকের সাহায্যে; এছাড়াও আছে ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার—টেলিভিশন ও অন্যান্য সেনসর। ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র প্রহরীদের বিরাট একটা বাহিনী গোটা ফ্যাসিলিটি পাহারা দেয়, প্রত্যেকের কাছে অটোমেটিক রাইফেল তো আছেই, সাইড

আর্মসও আছে।

অ্যালার্ম সিস্টেম বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে যাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে। ভল্টের ভেতর আছে তিন প্রস্থ তালা দেয়া কমপার্টমেন্ট, সেগুলোয় রাখা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য আরও সত্তরটা দেশের কমবেশি চোদ্দ হাজার টন সোনার বার। প্রতিটি বারের ওজন প্রায় সাতাশ পাউন্ড। ওখানে এমন কিছু নেই যা পকেটে লুকিয়ে বের করে আনা যাবে।

ওই ভল্ট থেকে সোনা বের করা এমন ধরনের জটিল একটা সমস্যা বা ধাঁধা, বেঁচে থাকলে সুখলাল চাকমা ভারি পছন্দ করতেন। তিনি আশা করতেন ফ্লয়িড ডকিং সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। সমস্যাটা একাধারে কঠিন, আবার সহজও বটে।

দ্বিতীয় বৈঠকে ওরা দু'জন, ফ্লয়িড ডকিং ও কবীর চৌধুরী, যার-যার শর্ত নিয়ে আলোচনায় বসল। ইতিমধ্যে মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছেন ফ্লয়িড। আলোচনায় বসে দু'জনেই একমত হলো, পারস্পরিক বিশ্বাস ছাড়া ফ্লয়িড যেমন তাঁর মেয়েকে সুন্দর একটা চেহারা উপহার দিতে পারবেন না, তেমনি কবীর চৌধুরীও ফেডারেল রিজার্ভ থেকে সোনা বের করতে সফল হবে না।

সোনা চুরির কাজ শেষ হতে সময় লাগবে কয়েক মাস। কিন্তু ফিলিপার মুখের অপারেশন শেষ হতে লাগবে মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময়। কবীর চৌধুরী শর্ত দিল, তার চাহিদার অর্ধেক সোনা ভল্ট থেকে বের করার পর ফিলিপার মুখে অপারেশন করবে সে। ফ্লয়িড তাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, সোনায় আপনি হাত লাগাবার আগে আমি দেখতে চাই অপারেশন সফল হয়েছে, ফিলিপা দেখতে হয়েছে আগের চেয়েও অনেক সুন্দর। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো–বিল্ডিঙের ভেতর কবীর চৌধুরীর লোকজনকে চাকরি দেবেন ফ্লয়িড, তবে তারা চুরির কাজ শুরু করতে পারবে

ফিলিপার অপারেশন হয়ে যাবার পর। আরও স্থির হলো, চুরির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিলিপা কবীর চৌধুরীর কাছে থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে ফ্লয়িড জানালেন, তিনি চান ফিলিপা যেন তার অভিনেত্রী দাদী তনিমা তাবাসসুমের চেহারা পায়।

একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো ফিলিপাকে। দু'দিন পর তার অপারেশন করল কবীর চৌধুরী। এ বোধহয় জাদুকেও হার মানায়, অপারেশন শতকরা একশো ভাগ সফল। দাদীর সঙ্গে মিল তো ছিলই আগে, তনিমার মুখের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ফটো দেখে কবীর চৌধুরী দক্ষ হাতে সেই একই মুখ যেন ফিলিপার ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছে।

ক্ষত শুকাবার পর আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ফিলিপা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। তনিমার সুন্দর চেহারা সে-ও পেতে চেয়েছিল, কিন্তু হুবহু এতটা মিলে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু বিস্ময় আর আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়াল ফ্লয়িডের অদম্য কান্না। ফিলিপা প্রথমে ধরে নিল বাবা নিশ্চয়ই আনন্দে কাঁদছেন। কিন্তু এক সময় তার সন্দেহ হলো। মেয়ে প্রশ্ন করতে একেবারে ভেঙে পড়লেন ফ্লয়িড। ধীরে-ধীরে সব কথা খুলে বললেন তিনি ফিলিপাকে। সবশেষে বললেন, 'তোর জন্যে আমি দেশের সঙ্গে বেঈমানী করেছি, মা।'

সেদিনই ফ্লয়িডের অনুপস্থিতিতে ফিলিপাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হলো, তারপর রোগিণী হিসেবে প্লেনে তুলে নিয়ে আসা হলো ফ্রান্সের নিসে। এখানে কিছুদিন ডক্টর ল্যাজারাসের স্যানাটরিয়ামে রাখা হয় তাকে, কিছু দিন এই ভিলায়। শয়তান ল্যাজারাসের উদ্দেশ্য যে ভাল ছিল না, সে তো রানা নিজেই জানে।

গল্প শোনার ফাঁকে ফিলিপাকে নিয়ে এক সময় ভিলায় ঢুকল রানা, মুখ-হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে দু'জন পাশাপাশি বসে খেলো। রানা ফিলিপাকে জানাল, ওর ধারণা ডক্টর ল্যাজারাস নিউ

ইয়র্কে ফিরে যাবে।

শুনে আঁতকে উঠল ফিলিপা, বলল, 'আমাকে হারিয়ে ওরা না বাবার কোন ক্ষতি করে...'

অভয় দিয়ে রানা বলল, 'সোনা চুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার বাবাকে ওদের দরকার হবে। তবে আমার ধারণা নিস থেকে অবশ্যই কবীর চৌধুরীকে ফোন করবে ল্যাজারাস। ফোন পেয়ে কবীর চৌধুরী অবশ্যই সাবধান হয়ে যাবে।'

'সাবধান হয়ে যাবে মানে?'

'ওরা হয়তো তোমার বাবাকে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে রাখবে।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ল্যাজারাস পালাবার পর দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।' চিন্তিত দেখাল ওকে। 'কি জানি, আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!' ফিলিপাকে অসহায় দেখাল।

'তোমার কাছে মিস্টার ফ্লয়িডের ফোন নম্বর আছে? বাড়ির?'

'বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। আছে। কিন্তু ফোন করলে বাবা নয়, অন্য লোক ধরে,' বলল ফিলিপা। 'বাবাকে চাইলে বলে তিনি নেই।'

'তবু এখুনি একবার ফোন করো।'

ফোনটা করা হলো ল্যাজারাসের বেডরুম থেকে। অপরপ্রান্তে বারবার শুধু রিঙই হলো, কেউ রিসিভার তুলছে না।

রানা বলল, 'প্লীজ, ফিলিপা, লক্ষ্মীটি। তুমি অস্থির হয়ো না। এরকম যে ঘটবে আমি তা জানতাম। ল্যাজারাস রিপোর্ট করায় কবীর চৌধুরী তোমার বাবাকে সরিয়ে ফেলেছে। চিন্তা কোরো না, আজকের ফ্লাইটে আমরাও নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি। আমার ধারণা, তোমাদের ফ্ল্যাটে নিশ্চয়ই কোন ক্লু পাওয়া যাবে। তোমার বাবাকে কোথায় রাখা হয়েছে এটা শুধু একবার জানতে পারলেই হয়, কথা দিচ্ছি তাঁকে আমি ওদের হাত থেকে উদ্ধার করব। চলো, এখুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। হাঁটতে পারবে তো? আমার গাড়িটা মাইল

দেড়েক দূরে।'

রানার কাছ থেকে রুমাল চেয়ে নিয়ে চোখ মুছল ফিলিপা, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'পারব।'

'আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে, তবে সেসব পরে হবে,' বলল রানা। 'এখন যাও, ছোট একটা ব্যাগে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও।'

'ওদের কিছুই আমি নেব না,' বলল ফিলিপা, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'শুধু পাসপোর্টটা নিয়ে আসি।'

কিন্তু দেড় মাইল হেঁটে হতাশ হতে হলো ওদেরকে। জায়গাটা চিনতে রানার ভুল হয়নি, এখানেই গাড়িটা রেখে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সেটা নেই। রানা আন্দাজ করল, ক্যাপ ফেরাট বাসস্ট্যান্ডে যাবার পথে নাদিম ও হাবিব সিত্রোঁটাকে চুরি করেছে। চুরি করা গাড়ির বুট ওরা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবে।

সাত

বাসস্ট্যান্ড থেকে নিজের হোটেলে ফোন করে বিল তৈরি করতে বলল রানা। দ্বিতীয় ফোনটা করল এক ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। প্যারিস হয়ে নিউ ইয়র্কগামী পরবর্তী ফ্লাইট এখন থেকে দু'ঘণ্টা পর। দুটো টিকিট বুক করল ও।

বাসস্ট্যান্ডেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল, পুরো এক ঘণ্টাও লাগল না নিসে পৌঁছাতে। হোটেল হয়ে ওরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছাল, প্লেন ছাড়তে তখনও বিশ মিনিট বাকি।

এই বিশ মিনিট রানার অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো ফিলিপাকে।

নিউ ইয়র্কে ফিলিপার অপারেশন করা হয় আজ থেকে প্রায় ছ'মাস আগে। বাবার মুখে ফিলিপা শুনেছে, অপারেশনের সাত মাস আগে থেকে কবীর চৌধুরীর লোকজন ফেডারেল রিজার্ভ বিল্ডিঙে ঢুকতে শুরু করে। কবীর চৌধুরীর পরামর্শ মত ভল্টের সিকিউরিটির সঙ্গে সরাসরি জড়িত গার্ডদের চাকরি খেতে শুরু করেন ফ্লয়িড। মিথ্যে অভিযোগে একজন করে গার্ডকে বরখাস্ত করেন, তার জায়গায় কবীর চৌধুরীর একজন লোককে ঢোকান। কিছু গার্ড বয়স হয়ে যাওয়ায় অবসর নেয়, তাদের বদলে আসে কবীর চৌধুরীর লোক। কেউ মারা গেলেও শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে চোর দিয়ে। এতভাবে লোক ঢুকিয়েও কবীর চৌধুরী সন্তুষ্ট হয়নি। ফ্লয়িডকে সে পরামর্শ দেয়, ম্যানেজমেন্টকে বলে পঁচিশজনের নতুন একদল গার্ডকে চাকরি দেয়ার ব্যবস্থা করুন। বাধ্য হয়ে তা-ও করেন ফ্লয়িড। এক পর্যায়ে বিল্ডিং ও ভল্টে কবীর চৌধুরীর সত্তরজন লোক পজিশন নেয়। ফিলিপার যেদিন অপারেশন হলো সেদিন থেকেই শুরু হলো সোনা চুরি। সত্তরজন গার্ড, প্রতিদিন প্রত্যেকে তারা একটা করে সোনার বার সরাচ্ছে, সেই বারের জায়গায় রেখে আসছে নকল বার। এ যেন ঘুণ পোকার কুরে-কুরে খাওয়া। একটা-দুটো করে সোনার বার কমছে। সত্তরজন লোক ছ'মাস ধরে এভাবে চুরি করলে প্রচুর সোনা বেরিয়ে যাবার কথা। তবে কবীর চৌধুরী তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কথায় কথায় ডক্টর ল্যাজারাস ফিলিপাকে জানিয়েছে, সময় ও পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে হলে কবীর চৌধুরীর লোকেরা ট্রাক ভর্তি করেও সোনার বার সরাচ্ছে। গর্বের সুরে ল্যাজারাস হিসেব দিয়েছিল, ওখানে এখন সম্ভবত আসলের চেয়ে নকল বারই বেশি আছে। তারমানে রিজার্ভের অর্ধেক সোনা এরইমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে কবীর চৌধুরী। সাত হাজার টন

সোনার দাম চলতি বাজার দরে কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রানার শেষ প্রশ্নের উত্তরে ফিলিপা জানাল, স্যানাটরিয়াম থেকে মোট দু'বার পালায় সে। প্রথমবার পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি, একটা ফোন বুদ থেকে লুইজি তাকে ধরে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার ভিলা থেকে স্যানাটরিয়ামে যাবার পথে ফিলিং স্টেশনে গাড়ি থামলে বাথরুমে যাবার নাম করে পালায় সে, তার আগে ল্যাজারাসের পকেট থেকে এক হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি করে।

প্যারিসে ওদেরকে প্লেন বদল করতে হলো। এবার ওদের বাহন প্রকাণ্ড বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন। আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার সময় রানার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ফিলিপা। দোষ কি, সারাটা রাত শরীরের ওপর ধকল তো আর কম যায়নি। ক্লান্ত রানাও, তবে ওর চোখে ঘুম নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটিতে পা রাখতে ইচ্ছে করছে ওর। ফিলিপার বাবা ফ্লয়িড ডকিংকে কবীর চৌধুরীর হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চুরিতে হাত দিয়েছে কবীর চৌধুরী, রানা তাকে অবশ্যই ঠেকাবে।

অবশ্য চুরি বন্ধ করা তেমন কঠিন কাজ নয়, কঠিন কাজ হলো ইতিমধ্যে চুরি করা সোনার সন্ধান পাওয়া। তা পেতে হলে একটা সূত্র দরকার, যে সূত্র ওকে কবীর চৌধুরীর আস্তানায় পৌঁছে দেবে।

ওরলি থেকে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায় ফোন করেছিল রানা, ওকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছে দু'জন এজেন্ট–মলি খন্দকার ও সৈয়দ জাকি। টার্মিনাল ভবনের একটা কফি শপে বসল ওরা। ফিলিপার সঙ্গে মলি ও জাকির পরিচয় করিয়ে দিল রানা, তারপর তাগাদার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, রিপোর্ট করো।'

'আপনার নির্দেশ পেয়েই রিভারসাইড ড্রাইভ-এর আটতলা

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি, মাসুদ ভাই,' শুরু করল মলি। 'আটতলায় একটাই ফ্ল্যাট, ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। শেষ খবর পেয়েছি দশ মিনিট আগে, ফ্ল্যাটে কেউ ঢোকেনি।'

'ওটা আমাদের ফ্ল্যাট,' বিড়বিড় করল ফিলিপা।

মাথা ঝাঁকিয়ে জাকির দিকে তাকাল রানা।

'ডক্টর ল্যাজারাস ও কবীর চৌধুরীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে লোক পাঠিয়েছি,' বলল জাকি। 'কয়েকটা মাফিয়া পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। আশা করছি মাঝরাতের আগেই ভাল-মন্দ কিছু একটা খবর পাব।'

হাতঘড়ি দেখল রানা, পাঁচটা বিশ। 'সেইফ হাউস, জাকি?'

'রেডি রাখা হয়েছে, মাসুদ ভাই।'

'সেইফ হাউস? সেইফ হাউস দিয়ে কি হবে?' ফিলিপা অবাক।

ফিলিপার দিকে তাকাল রানা। 'আশা করি তুমি বুঝতে পারছ যে আমরা একটা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি চালাই। মলি ও জাকি ছাড়াও আমাদের দলে আরও অনেক এজেন্ট আছে। আমরা সবাই বিশেষ ধরনের ট্রেনিং নিয়েছি, প্রত্যেকের কাছে ফায়ার আর্মসও আছে। তোমাকে এত কথা বলছি এই জন্যে যে আমরা কবীর চৌধুরীর খোঁজ পেলেই রীতিমত একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সেই যুদ্ধে তোমার মত বাচ্চা মেয়ের কোন ভূমিকা থাকবে না। তাছাড়া, তোমাকে দেখলে কবীর চৌধুরী আবার জিম্মি করতে চাইবে। তাই, যুদ্ধ শুরুর আগেই তোমাকে আমরা একটা সেইফ হাউসে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফিলিপার চোখ দুটো ছলছল করছে। 'আপনি আমাকে নিজের জান নিয়ে পালাতে বলছেন? বাবার কি হলো, কোথায় আছে, এ-সব না জেনে নিরাপদ কোথাও গিয়ে বসে থাকব?'

রানা যুক্তি দিল, 'বাবাকে সাহায্য করতে হলে তোমার প্রথম

কাজ হবে কবীর চৌধুরীর নাগালের বাইরে থাকা। আমরা যে সেইফ হাউসে তোমাকে রাখব তার হদিশ কেউ বের করতে পারবে না।'

'এমনও তো হতে পারে, বাবাকে ওরা ধরে নিয়ে যায়নি,' বলল ফিলিপা। 'বাবা হয়তো অফিস থেকে ঠিকই রোজকার মত সাতটায় ফ্ল্যাটে ফিরবে। আর যদি ধরে নিয়ে যায়ই, বাবা হয়তো ফ্ল্যাটে কোন ক্লু রেখে গেছে। সেই ক্লু আপনার চেয়ে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাব আমি।'

রানা ইতস্তত করছে।

'তাছাড়া,' একটু যেন অভিমান হয়েছে, অন্তত ঠোঁট ফোলানো দেখে সেটাই ধরে নিতে হয়, 'সেইফ হাউসে একা-একা আমার সময় কাটবে কিভাবে? অন্তত ফ্ল্যাট থেকে আমার জাপানি...' বিব্রত হয়ে থেমে গেল ফিলিপা, স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে এই বয়সেও পুতুল নিয়ে খেলে সে।

'ঠিক আছে,' ব্যাপারটা ধরতে পেরে মলিই তাকে উদ্ধার করল। 'ফ্ল্যাটে তুমি যাচ্ছ ঠিকই, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, যা নেয়ার নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সমাধানটা মেনে নিল রানা। তবে মলিকে বলল, 'সেক্ষেত্রে, ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার সময় ফিলিপাকে কেউ যেন দেখতে না পায়।'

বাইরে ওদের জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, ওরা চারজন উঠে বসতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

রিভারসাইড ড্রাইভ অত্যন্ত পুরনো ও বনেদি এলাকা, এখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়ি কমবেশি একশো বছরের পুরনো। রাস্তাটা অসম্ভব চওড়া, মাঝখানের আইল্যান্ডে আকাশছোঁয়া সারি সারি মেপল ট্রী দাঁড়িয়ে আছে। ফিলিপাদের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটা অবশ্য প্রায় নতুনই বলতে হবে। ওদের গাড়ি ভবনটার সামনে

থামতে রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট কোত্থেকে যেন উদয় হলো, চাপা গলায় রিপোর্ট করল রানাকে, 'ছাদে ও রাস্তায় সব মিলিয়ে আমরা পাঁচজন, মাসুদ ভাই। কারও চোখেই সন্দেহ করার মত কিছু ধরা পড়েনি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ ফ্ল্যাটে ঢুকেছ?'

'আপনি বললে এখন ঢুকি।'

'না, আমিই ফিলিপাকে নিয়ে ঢুকব,' বলল রানা। 'আমাদের সঙ্গে মলি আর জাকি থাকবে। অতিরিক্ত একটা গাড়ি রাখো, আধঘণ্টা পর ফিলিপাকে সেফ হাউসে পৌঁছে দেবে। আরও অন্তত দুটো গাড়িতে থাকবে তোমরা, পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে ওকে। তবে পুরো ব্যাপারটাই কৌশলে সারতে হবে। চুল-দাড়ি ব্যবহার করবে, ফিলিপাকে যেন বুড়ো মানুষ মনে হয়।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

এলিভেটরে অপেক্ষা করছিল রানা এজেন্সির আরও একজন এজেন্ট। সে জানাল, আটতলার করিডর গত দেড় ঘণ্টা ধরে ফাঁকা।

আটতলার করিডরটা ছোট। এলিভেটর থেকে নেমে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। 'চাবি?'

'ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি চালান, আগে ভাবেননি দরজা কিভাবে খুলবেন?' ফিলিপার চোখের তারায় কৌতুক ঝিক করে উঠল।

'আমরা প্রফেশনাল, ফিলিপা,' মুচকি হেসে বলল মলি, হাতব্যাগ থেকে একটা চাবির গোছা বের করল। 'এতে মাস্টার কী আছে, সব তালাই খোলা যাবে।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' বলে দরজার এক পাশে সরে গেল ফিলিপা।

মাস্টার কী দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মলি। হেসে উঠে ফিলিপা বলল, 'আমার বাবা হলো তালার রাজা। এই

দরজার তালা তার নিজের হাতে তৈরি। খুলতে হলে নির্দিষ্ট একটা চাবি লাগবে।'

'সেটা এখন আমরা পাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রায়ই চাবি হারিয়ে ফেলতাম তো, তাই স্কুল থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারতাম না,' বলল ফিলিপা। 'বাবা বাধ্য হয়ে আগের তালা বদলে এটা লাগাল। দেখুন, তালার ভেতর থেকেই কিভাবে চাবি বের করি।' মলি সরে যেতে দরজার সামনে দাঁড়াল সে। তালাটা ধরে পাঁচবার ডান দিকে, দু'বার বাম দিকে, আবার পাঁচবার ডান দিকে মোচড়াল সে, সবশেষে তালার মাথায় আঙুলের গিঁট দিয়ে তিনটে টোকা দিল–সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে তালার নিচে সরু একটা ফাটল সৃষ্টি হলো, ভেতর থেকে আধ ইঞ্চি মুখ বের করল লম্বা একটা চাবি। দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল সে, বাবার ম্যাজিকে গর্বিত কন্যা।

ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে সময়ক্ষেপণের নানা ফন্দি-ফিকির বের করতে লাগল ফিলিপা। মলি তাকে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেয়ার তাগাদা দিলেও, শুনতে না পাওয়ার ভান করে রানার সঙ্গে ঘুর-ঘুর করে ক্লু খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সবগুলো কামরা ভালমত সার্চ করার পর রানা বলল, 'না, মিস্টার ফ্লয়িড কোন সূত্র রেখে যাননি।'

'দাঁড়ান, আগে নিশ্চিত হয়ে নিই সত্যি বাবাকে ওরা নিয়ে গেছে কিনা,' বলে ফেডারেল রিজার্ভের মূল ভবনে ফোন করল ফিলিপা। 'এটা বাবার প্রাইভেট নাম্বার।'

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল আনসারিং মেশিন, 'আপনার কোন মেসেজ থাকলে দিন, মিস্টার ফ্লয়িড সময় ও সুযোগ মত আপনাকে কলব্যাক করবেন।' শুনে ম্লান হয়ে গেল তার চেহারা। বলল, 'লক্ষণ ভাল নয়, মিস্টার রানা। বাবা অন্তত এই নম্বরে আনসারিং মেশিন ফিট করবে না।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার ধারণা তাকে জিম্মি

করা হয়েছে। প্রচুর সোনা সরাবার পর কবীর চৌধুরী কোন ঝুঁকি নিতে চাইবে না। ঠিক আছে, ফ্ল্যাটটা আরেকবার সার্চ করব আমি, কিন্তু তুমি চলে যাবার পর। তাড়াতাড়ি করো, প্লীজ।'

ওয়ার্ড্রোব থেকে কাপড়চোপড় বের করে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ফিলিপা। 'শাওয়ার সারতে আমার তিন মিনিট লাগবে। মলিকে বলুন, তিনি যেন একটা সুটকেসে আমার জাপানি বান্ধবীদের শুইয়ে রাখেন।'

বাথরুম থেকে পনেরো মিনিট পর বেরুল সে, বেরিয়েই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা আপনি কোথায় পেলেন?' তাকিয়ে আছে মলির হাতে ধরা চৌকো একটা আইভরি বক্সের দিকে।

হকচকিয়ে গেল মলি, বলল, 'পেয়েছি শো-কেসে, যেখানে তোমার পুতুল আর খেলনাগুলো ছিল। কেন, কি এটা?'

রানার দিকে তাকাল ফিলিপা। 'এই বাক্সটার কথাই বলেছি আপনাকে। সেই সুখলাল চাকমা গ্রামের হেডম্যানের কাছে রেখে যান বাবাকে দেয়ার জন্যে। কিন্তু ওটার তো আমার শো-কেসে থাকার কথা নয়।'

'তাহলে কোথায় থাকার কথা?'

'কি জানি...বাংলাদেশ ছাড়ার পর আজই প্রথম দেখছি ওটা। আমার শো-কেসে বাবাই নিশ্চয় রেখে গেছে। কেন? ওটা তো জাদুর বাক্স, ভেতরে বাবা কিছু রেখে যায়নি তো?'

মলির হাত থেকে বাক্সটা নিল রানা। পুরো বাক্সটাই হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি, দেখতে ভারি সুন্দর, চারপাশে খোদাই করা হয়েছে বিভিন্ন পশুপাখির আকৃতি। ঢাকনি ধরে টান দিল ও। এক চুল নড়ল না।

চোখে সহানুভূতি নিয়ে রানার দিকে তাকাল ফিলিপা। 'এত সহজ ভাববেন না। সুখলাল বুড়ো আসলে বাক্স তৈরি করে ধাঁধার জন্ম দিতেন, মনে আছে?'

'কিভাবে খোলে এটা?'

'তা তো আমি জানি না।'

'সেক্ষেত্রে ভেঙে না ফেলে উপায় নেই।' রানা গম্ভীর।

'এরকম দামী একটা জিনিস ভেঙে ফেলবেন?' আহত দেখাল ফিলিপাকে।

'চোদ্দ হাজার টন সোনার দাম আরও অনেক বেশি,' বলল রানা। আবার নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করছে বাক্সটা। মাথায়, তলায়, দু'পাশে আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা মারল। সম্ভাব্য সব জায়গায় টেপাটিপি করল। চাপ দিল কোণগুলোয়। ঝাঁকাল। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ফিলিপার দিকে তাকাল ও। 'মাথায় কোন আইডিয়া আসছে?'

মাথা নেড়ে ফিলিপা বলল, 'সমাধানটা হবে এক অর্থে জটিল, আরেক অর্থে সহজ। সুখলালের এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনাকে তিনি সাংঘাতিক কঠিন একটা ধাঁধা দেবেন, অথচ সমাধানটা প্রথম থেকেই আপনার চোখের সামনে পড়ে থাকবে।'

'চোখের সামনে পড়ে থাকবে?' হাসতে গিয়েও রানা হাসল না। বাক্সটা ওর কোলের ওপর পড়ে রয়েছে। ঢাকনির ওপর চোখ রাখল ও। খোদাই করা বেশ কিছু প্রাণী দেখা যাচ্ছে। একাধিক সিংহ, একাধিক বাঘ, একাধিক বানর, একটা শেয়াল, একটা কুকুর; সাপ, ভালুক, জিরাফ, তিমি, পেঁচা, গরিলা ও হরিণ–সবগুলোই একাধিক। 'কাগজ-কলম নাও,' বলল রানা। 'আমি বলি তুমি লেখো।'

টেবিল থেকে কাগজ আর কলম নিয়ে রানার পাশে সোফায় বসল ফিলিপা। জাকি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মলি।

'লেখো। মাথার দিকে চুয়ান্নটা প্রাণী। প্রতি সাইডে তেরোটা করে। তলায় কিছু নেই। সব মিলিয়ে একশো ছ'টা। লিখছ? ছ'টা সিংহ। আটটা হাতি। বানর–আটটা। ভালুক–তিন। একটা কুকুর। সাপ–পাঁচ। দুটো পেঁচা। তিমি–চার। লামা–পাঁচ। তিনটে

জিরাফ। একটা শেয়াল। গরিলা–চার। মোষ–পাঁচ। পাঁচটা ময়ূর আর তিনটে কুমির। যোগ করে দেখো, একশো ছ'টা হয়?'

যোগ করল ফিলিপা। 'হয়।'

তালিকাটা নিয়ে চোখ বোলাচ্ছে রানা, ঝুঁকে ফিলিপাও দেখছে। 'কোন বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ছে?'

মাথা নাড়ল ফিলিপা। 'নূহ নবীর নৌকায় তোলার জন্যে অতিথিদের তালিকা।'

'প্রতিটি প্রাণী শুধু একজোড়া করে থাকতে পারবে, বাকিগুলোকে নামিয়ে দেয়া হবে নৌকা থেকে।'

তালিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফিলিপা। 'তাতে কিছু সমস্যা আছে।'

'সমস্যা?'

'সমস্যা কুকুর আর শেয়ালকে নিয়ে,' বলল ফিলিপা। 'ওগুলো মাত্র একটা করে। ওরা কিছু জানে বলে সন্দেহ করেন?'

বিদ্যুৎচমকের মত আইডিয়াটা খেলল মাথায়, হেসে উঠে রানা জবাব দিল, 'বোধহয় জানে। লক্ষ করো, তিনটে ব্যতিক্রম বাদে প্রতিটি প্রাণীর সংখ্যা দুই-এর বেশি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ফিলিপা। 'একজোড়া পেঁচা, একটা শেয়াল, একটা কুকুর।'

'পেঁচা কি?'

'জ্ঞানের প্রতীক?'

'হ্যাঁ। পেঁচাগুলো কোথায় দেখতে পাচ্ছ?'

'শেয়াল আর কুকুরের ওপর। তাতে কি?' জিজ্ঞেস করল ফিলিপা।

রানা বলল, 'ফক্স অ্যান্ড ডগ।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল [illegible]

'এফ ও ডি,' বলল রানা। 'ফ্রয়িড [illegible] সংক্ষেপ। শেয়ালের আকৃতিতে চাপ দিল ও। কিন্তু কিছুই ঘটল [illegible]

'ওহ্, গড!' ফিসফিস করল ফিলিপা।

'ধৈর্য ধরো, এখুনি হাল ছেড়ো না,' বলল রানা। শেয়াল ও কুকুরের ওপর একটা করে আঙুল রাখল। 'দেখো কি ঘটে!' জোরে চাপ দিল ও। দুই আঙুলের নিচে দুটো প্রাণীই নিচের দিকে ডেবে গেল। বাক্সের ভেতর কোথাও থেকে এত অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরুল, কোনরকমে শুনতে পেল ওরা। হাতটা সরিয়ে নিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে খুলে গেল ঢাকনিটা।

বাক্সটার ভেতর থেকে ছোট্ট একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, তাতে লেখা–'আমি জানতে পেরেছি সোনা পাচার করার কাজে কবীর চৌধুরীকে সাহায্য করছে প্রক্টর অ্যাক্রব্যাটিক ট্রুপ ও সিটি থিয়েটারের মালিক গ্রেগরি প্রক্টর।'

গ্রেগারি প্রক্টর! চমকে উঠল রানা। তবে ফিলিপাকে কিছু বলল না।

হাতের লেখা যে ফ্লয়িড ডকিং-এরই, ফিলিপা তা চিনতে পারল। কাগজের মাথায়, বাম কোণে আজকের তারিখ লেখা, সময়ের উল্লেখ সহ–সকাল আটটা পাঁচ মিনিট।

এ থেকে বোঝা গেল, ডক্টর ল্যাজারাস সময় নষ্ট করেনি। রানা যেমন সন্দেহ করেছিল, সম্ভবত নিস থেকেই কবীর চৌধুরীকে টেলিফোন করে ফিলিপার অসহযোগিতা ও জনৈক মাসুদ রানার শত্রুতা সম্পর্কে রিপোর্ট করে সে, পরামর্শ দেয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্লয়িড ডকিংকে যেন তাঁর ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের আস্তানা বা কোন সেফ হাউসে রাখা হয়। এর মানে হলো, কবীর চৌধুরী এখন জানে যে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে এবার মাসুদ রানা।

তবে একটা রহস্য থেকেই গেল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এই চিরকুট কার উদ্দেশে রেখে গেছেন ফ্লয়িড। তাছাড়া, মেসেজ লেখা ও তা লুকানোর সময় বা সুযোগ তিনি পেলেন কিভাবে?

এমন কি হতে পারে, এই চিরকুট একটা টোপ? কবীর চৌধুরী নিজে ফেলে গেছে?

ব্যাপারটা নিয়ে সময় নষ্ট করতে রানার মন চাইছে না। ক্লু যখন একটা পাওয়া গেছে, সেটা ধরেই ওকে কাজ শুরু করতে হবে। সন্ধে হতে আর বেশি দেরিও নেই, এখুনি কাজে নেমে পড়া দরকার। ক্লুটা পাবার পর গোটা পরিস্থিতি বদলে গেছে, পাশের ঘরে গিয়ে শুধু মলি আর জাকির সঙ্গে নিভৃতে আধঘণ্টা পরামর্শ করল রানা। কবীর চৌধুরীর খোঁজে মাফিয়া চীফ প্রক্টরের হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছে ও, সেখানে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে, সে-কথা মনে রেখে ওঁদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখল ও। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে রানার বান্ধবী কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলিকে ধরে হোয়াইট হাউসকে সব জানিয়ে দিতে হবে।

'আর এক মিনিটও তোমার দেরি করা চলে না,' পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে ফিলিপাকে বলল রানা। 'আমাদের ওপর ভরসা রাখো, তোমার বাবাকেও উদ্ধার করা হবে, রিজার্ভের সোনাও আশা করি তোমাদের সরকার ফেরত পাবে। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত পাশের ঘরে গিয়ে ছদ্মবেশ নাও।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

দাঁড়াল ফিলিপাও। 'আপনাকে ছোট্ট একটা খবর দিই,' বলল সে। 'আপনি আমার প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচিয়েছেন, বাবাকে একদল শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন, অথচ আমাদের কাছে এমন কিছু নেই যে আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারব। তবে আমি জানি সরকার আপনাকে পুরস্কৃত করবে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা, চোখে প্রশ্ন।

'খবরটা হলো, ফেডারেল রিজার্ভের একটা ঘোষণায় বলা আছে, তাদের চুরি যাওয়া সোনা কেউ যদি কখনও উদ্ধার করে দিতে পারে তাকে পুরস্কার হিসেবে শতকরা দশ ভাগ দেয়া হবে।

'আমাকে যেন আবার ভুল বুঝবেন না,' আবার বলল ফিলিপা। 'আমি খুব ভাল করেই জানি আপনি সাহায্য করছেন কোন কিছু পাওয়ার লোভে না। সাহায্য করছেন...সত্যি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না,' কেমন যেন অসহায় দেখাল তাকে। 'একটাই সম্ভাবনা, আপনি দেবতুল্য একজন মানুষ, কারও বিপদ দেখলে স্থির থাকতে পারেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আর সেজন্যেই জানতে ইচ্ছে করছে আপনার কোন ছোট বোন আছে কিনা, আমার মত?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আমার কোন বোন নেই, ঠিক তোমার যেমন কোন বড় ভাই নেই।'

এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল ফিলিপা। 'নেই, তবে দরকার,' বলল সে। 'ঠিক আপনার মত নিঃস্বার্থ একজন।' হাতটায় একটু চাপ দিয়ে চোখের পানি গোপন করার জন্যে ঘুরে দরজার দিকে এগোল সে, বিড়বিড় করে বলছে, 'যেখানে খুশি যান, যা খুশি করুন, শুধু এমন কোন ঝুঁকি নেবেন না যাতে ফিলিপা তার সদ্য পাওয়া ভাইটাকে হারিয়ে বসে।'

মলিকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফিলিপা।

আট

রক্তপাতহীন হলেও, রীতিমত অভ্যুত্থান ঘটিয়েই নিউ ইয়র্কের আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে গ্রেগরি প্রক্টর। তার সবচেয়ে বড় পুঁজি নাকি দুই ডজন পুত্র সন্তান। বলাই

বাহুল্য, তাদের বেশির ভাগই অবৈধ। মতান্তরে, গ্রেগরি প্রক্টরের সবচেয়ে বড় পুঁজি তার কৌতুক-প্রবণতা ও উদ্ভট বাস্তব-বুদ্ধি। যে-সব প্রস্তাব শুনলে মানুষের হার্ট অ্যাটাক করার কথা, প্রক্টর সে-সব স্বতস্ফূর্ত হাস্যরসের সঙ্গে উত্থাপন করতে পারে। যেমন, মেয়র জুলিয়ানিকে সে বলেছিল, সিটি করপরেশন শহরের বিভিন্ন সড়ক ও সেতু থেকে বছরে পাঁচ কোটি ডলার টোল তোলার জন্যে কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ করে দেড় কোটি ডলার, অর্থাৎ সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে মাত্র সাড়ে তিন কোটি ডলার: প্রক্টর মেয়রকে পুরো পাঁচ কোটিই দেবে, দেবেও বছরের শুরুতে পুরোটা অগ্রিম, মেয়র শুধু টোল আদায়ের দায়িত্বটা তার ওপর ছেড়ে দেবেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তার প্রস্তাবে মেয়র রাজি হয়ে যান, তবে শর্ত দেন প্রক্টর টোলের হার বাড়াতে পারবে না। উত্তরে মুচকি হেসে প্রক্টর জবাব দেয়, টোলের হার বাড়বে তো নাই-ই, বরং কমে যাবে। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যি আগের চেয়ে কম হারে টোল তুলছে সে। প্রশ্ন হলো, এই ব্যবসায় প্রক্টর লাভ করছে কিভাবে?

করপোরেশনের কর্মচারীরা আদায় করা টোল কম দেখিয়ে বছরে দেড় কোটি ডলার চুরি করত। ধরা পড়লেও তাদের তেমন কোন শাস্তি হত না বলে চুরি ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রক্টরের লোকেরা ভয়ে চুরি করে না, কারণ ধরা পড়লে চোর শুধু শাস্তিই পাবে না, তার পরিবারের সবাই প্রাণ হারাবে। চুরি ঠেকিয়ে দেড় কোটি ডলার বাঁচাল প্রক্টর, কিন্তু টোলের হার কমাবার ফলে আয়ও প্রায় ওই একই পরিমাণে কমে গেল, অর্থাৎ দেড় কোটি ডলার। ধাঁধাটা রয়েই গেল—প্রক্টর এই ব্যবসা থেকে পাচ্ছেটা কি?

শহরে ঢোকার সড়ক ও সেতুতে নিজের লোকদের বসাতে পেরেছে প্রক্টর, এটাই তার লাভ। তার লোকজন ইউনিফর্ম পরে, সঙ্গে ফায়ারআর্মস ও মোবাইল ফোন রাখে, হাবভাব দেখে মনে হয় পুলিস নয়, পুলিসের বাবা। এই বাবাদের কড়া নজরদারির

ফলে অন্য কোন মাফিয়া পরিবারের ড্রাগস নিউ ইয়র্কে প্রবেশ করতে পারে না। টোল আদায়ের দায়িত্ব পাবার পর থেকে প্রক্টরের হেরোইন বিক্রির পরিমাণ চারগুণ বেড়ে গেছে।

যে-কোন ব্যবস্থা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে লাভজনক প্রস্তাব, এটাই প্রক্টরের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই অস্ত্র ব্যবহার করে অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ ব্যবসা দখল করে নিয়েছে সে। রক্তপাতহীন এই অভ্যুত্থানে তার সময় লেগেছে মাত্র তিন বছর।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রক্টরের সব প্রস্তাব যে প্রতিপক্ষরা মেনে নিয়েছে, তা নয়। যারা তার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অকস্মাৎ আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো চারদিক থেকে এমন সব অপ্রত্যাশিত ঝামেলা দেখা দিয়েছে যে তারা আর ব্যবসা চালাতে পারেনি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসার মালিক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুনও হয়ে গেছে।

এক লাখেরও বেশি লোক প্রতিদিন লোকজনের অফিস বা বাড়ির দরজায় নক করে, উদ্দেশ্য কিছু না কিছু বিক্রি করা—বীমা পলিসি, ধর্মীয় বই-পুস্তক, কিস্তিতে জমি বা ফ্ল্যাট কেনার প্রসপেক্টাস, লটারির টিকিট, ইলেকট্রনিক্স, খাবারদাবার, ওষুধ, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। এদের প্রায় অর্ধেকই প্রক্টরের বেতনভুক, এটা-সেটা বিক্রি করার ছলে গ্রাহকদের কাছে ড্রাগস, ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট ইত্যাদি সাপ্লাই দেয়, সেই সঙ্গে নতুন-নতুন গ্রাহকও সংগ্রহ করে।

গত সিনেট ইলেকশনে স্থানীয় প্রার্থীকে একটা ডলারও খরচ করতে হয়নি, প্রক্টর নিজ খরচে তাকে জিতিয়ে এনেছে। ফলে প্রক্টর যখন দাবি করে সিনেটর তার ব্যক্তিগত বন্ধু, খবরের কাগজে তা প্রথম পাতায় ছাপাও হয়, কিন্তু সিনেটর প্রতিবাদ করতে পারেন না। এতে লাভ হয় এই যে শত্রুরা বুঝতে পারে প্রক্টরের রাজনৈতিক ক্ষমতা কতটুকু।

গ্রেগরি প্রক্টরের বাবা ছিল হলিউডের কৌতুকাভিনেতা, মা ছিল সার্কাস পার্টির অ্যাক্রোব্যাট। সেই সূত্রে, বাবার সম্মানে, সিটি থিয়েটারে শুধু তার বাবার অভিনীত সিনেমাই প্রদর্শিত হয়। বছরে দু'তিনবার অ্যাক্রব্যাটও দেখানো হয়, প্রক্টরের পরলোকগত মায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে। ওই একই ঠিকানায় আরও তিনটে সিনেমা হল, দুটো প্রাইভেট মিউজিয়াম, একটা সুপারমার্কেট, সাতটা রেস্তোরাঁ, দুটো ক্যাসিনো, ইনডোর টেনিস কোর্ট, একাধিক সুইমিং পুল ইত্যাদি আছে। সবগুলোর মালিকই প্রক্টর পরিবার। ম্যানহাটন ব্রিজের একপ্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে সুউচ্চ কাঠামো নিয়ে প্রক্টর মল, পুরো একটা ব্লক বা পাড়া জুড়ে ওটার বিস্তার, আসলে কয়েকটা সংলগ্ন ভবনের সমষ্টি, শেষ হয়েছে চায়না টাউনের প্রবেশপথের কাছে এসে।

শত্রুর বাড়িতে ধরা না পড়ে ঢুঁ মারতে হলে একা আসতে হয়, রানাও তাই এসেছে। জানা কথা প্রতিটি ভিড়ের ওপর কড়া নজর রাখছে প্রক্টরের লোকজন, তাদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে ব্রিজের কাছাকাছি একটা ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংকের মাথা থেকে রশি বেয়ে প্রক্টর মল-এর বহু ছাদের একটায় নেমেছে ও। ছ'তলা, পাঁচতলা, তিনতলা, এরকম পাঁচ-সাতটা ছাদ হয়ে এই মুহূর্তে একটা চারতলা ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে ধুলো মাখা স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। ওর নিচে একটা স্টেজ। সেখানে খালি গায়ে এক লোককে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে ব্যাকলেস ড্রেস পরা একটা মেয়েও রয়েছে। দর্শকদের দিকে মুখ করে বো করল মেয়েটা। করতালির অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল।

কিনারা থেকে মঞ্চের ভেতর দিকে সরে এসে বিচ্ছিন্ন হলো তারা, লোকটা যেদিকে গেল তার উল্টোদিকে রওনা হলো মেয়েটা। সাদামাঠা একটা কাঠের টেবিলে রাখা চীনামাটির পাত্রে এক গাদা রঙিন বর্শা দেখা যাচ্ছে।

একটা খুদে বর্শা তুলে নিয়ে লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল

মেয়েটা। ডান হাত মাথার পাশে ও পিছনে তুলে লক্ষ্যস্থির করল সে, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ল। চোখের পলকে লোকটার চওড়া পিঠে গেঁথে গেল বর্শাটা, গাঁথার পর থরথর করে কাঁপছে, চামড়ার ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে এল।

ওখান থেকে পিছিয়ে এল রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হলো আশপাশে কেউ নেই। ইতিমধ্যে মাত্র চারটে ছাদের স্কাইলাইট দেখা হয়েছে। কোমরে হুক লাগানো দীর্ঘ এক প্রস্থ নাইলন কর্ড থাকায় ছাদ থেকে ছাদে ওঠানামা করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

এই ছাদের আর মাত্র একটা স্কাইলাইট দেখা বাকি। এটাও ধুলোয় ঢাকা, তবে পুরোপুরি ঝাপসা নয়। ঝুঁকে কাঁচের ভেতর দিয়ে নিচে তাকাতেই পালস রেট বেড়ে গেল রানার।

ওর নিচে অভূতপূর্ব একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। কুশীলবরা সংখ্যায় তিনজন হলেও, রানা চিনতে পারল মাত্র দু'জনকে; তবে তৃতীয় লোকটার পরিচয় আন্দাজ করতে ওর কোন অসুবিধে হলো না—ফুটবল আকৃতির মাথা, ঢোল সদৃশ্য পেট আর কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ি নিয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে সকৌতুক হাসি, এ লোক গ্রেগরি প্রক্টর না হয়েই যায় না।

কুশীলব বলে গণ্য করা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে সুসজ্জিত অফিস কামরায় একটা টেরিয়ারও আছে, নাটকটায় তার ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সুট পরা এক লোক কার্পেটে হাঁটু গেড়ে অতি যত্ন ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছোট্ট কুকুরটার বাঁকা লেজ সোজা করার চেষ্টা করছে। কাজটায় প্রতিবারই সফল হচ্ছে সে, কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য হলো, ছেড়ে দিলেই আবার লেজটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছে রানা। ডক্টর লুথার ল্যাজারাস।

তৃতীয় লোকটা পালা করে তিনটে কাজে ব্যস্ত। লম্বা কামরার

এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পায়চারি করছে সে, হাঁটার ভঙ্গিতে কোন রকম অস্থিরতা প্রকাশ না পেলেও, মাঝেমধ্যে হাতের কালো ছড়িটা তুলে চরকির মত বাতাসে ঘোরাবার সময় তার উত্তেজনা ও নার্ভাসনেস ধরা পড়ে যাচ্ছে। মেহগনি কাঠের মাঝারি টেবিলে দাবার বোর্ড খুলে ঘুঁটি সাজানো হয়েছে, প্রয়োজনের সময় পায়চারি থামিয়ে চাল দিচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি। যতই পায়চারি করুক বা ছরি ঘোরাক, প্রতিপক্ষ প্রক্টর খেলায় চুরি করছে কিনা সেদিকে কড়া নজর রাখছে সে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো লোকটার শেষ কাজটা। প্রতিবার চাল দেয়ার পর কামরার এক কোণে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সে। মুখ ফুটে কিছু বলতে হচ্ছে না, সে কোণে গিয়ে দাঁড়ালেই ডক্টর ল্যাজারাস কুকুরের লেজ সোজা করার সাধনায় বিরতি দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তৃতীয় ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ঢিলেঢালা, চোখে মুখে এমন একটা ভাব, সেটাকে সনাক্ত করা বেশ কঠিন–প্রত্যাশাও হতে পারে, আবার সহ্যগুণ সঞ্চয় করার জেদও হতে পারে। ডক্টর ল্যাজারাস দাঁড়াতে যা দেরি, তৃতীয় ব্যক্তি পিছন থেকে তার দিকে ছুটে আসছে। পায়চারি করার সময় টের পাওয়া যায় না, তবে এই ছুটে আসার সময় বোঝা যায় তৃতীয় ব্যক্তির ডান পায়ে নিশ্চয়ই অসুবিধে আছে–এটা সম্ভবত নকল পা। যাই হোক, ছুটে এসে ওই ডান পা দিয়েই ডক্টর ল্যাজারাসের চ্যাপ্টা নিতম্বে ঝেড়ে একটা লাথি মারছে সে।

এত জোরাল লাথি খেয়েও ডক্টর ল্যাজারাস পড়ে যাচ্ছে না। কারণ, সম্ভবত তার প্রস্তুতি। জানে লাথি খাবে, তাই শরীরটাকে যতটা সম্ভব শিথিল করে রাখছে সে। তারপরও ছিটকে গিয়ে দেয়ালে পড়ছে, জানালার গ্রিল ধরে কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকছে। লাথি মারার পর দুই কি তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করছে তৃতীয় কুশীলব, যে-ই বুঝতে পারছে যে

ল্যাজারাসের পতন ঘটবে না, সাথে সাথে আবার সেই আগের ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করছে, ভুলেও আর ল্যাজারাসের দিকে তাকাচ্ছে না। ল্যাজারাসও গোঙাতে গোঙাতে ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করছে।

তবে একবার ল্যাজারাস পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছকটাও গেল বদলে। মেঝে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সিধে হলো সে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে আগের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াল, তৃতীয় ব্যক্তির দিকে আগের মতই পিছন ফিরে–ইতিমধ্যে সে-ও তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কামরার এক কোণে। ছুটে এসে ফের লাথি।

বোঝা গেল, ভয়ানক কোন অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে ডক্টর ল্যাজারাস। নিয়ম হলো, অপরাধীর পড়ে যাওয়া চলবে না, পড়লে শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

তৃতীয় ব্যক্তির বেশভূষা বেশ বৈচিত্র্যময়। মাথায় একটা পেল্লায় আকৃতির পানামা হ্যাট। চোখে পিরিচসদৃশ্য লেন্সসহ স্টীল ফ্রেমের সানগ্লাস। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরে আছে কালো একটা চুরুট। হাতের ওয়াকিং স্টিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। পরেছে কালো সিল্কের ঢোলা আলখেল্লা। সব মিলিয়ে প্রকাণ্ড একটা বাদুড় যেন। ড্রাকুলা বা রক্তচোষা বাদুড় নয়, তবে তার চেয়েও বড় দুঃসংবাদ। এই সেই নাটের গুরু হচ্ছে রানার পরম শত্রু, কুখ্যাত পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরী।

ডক্টর ল্যাজারাসকে শাস্তি ভোগ করতে দেখে ভালই লাগল রানার। তবে আরও অনেক কঠিন শাস্তি প্রাপ্য তার। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে নাটক দেখার জন্যে আসেনি ও। স্কাইলাইটের কাঁচ যেখানে জোড়া লেগেছে সেখানে কান ঠেকিয়েও কিছু শুনতে পেল না। কাঠামোটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে–সাবধানে পা ফেলে, মাথা নিচু, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একটা হাত স্কাইলাইটের কিনারায়। একটু পরই ওর আঙুলের নিচে এক প্রস্থ কাঁচ নড়ে উঠল। মাথাটা

আরও নামিয়ে নিল রানা, এখনও নিচের কামরায় তাকিয়ে আছে। ওরা তিনজন অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। আরেকটা চাল দিল কবীর চৌধুরী। ল্যাজারাসের নিতম্বেও আরেকটা লাথি জুটল।

রানার আঙুল আলগা কাঁচের কিনারায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ফ্রেমটাকে ধরে রাখা পুটিন বহু আগেই শুকিয়ে ও ক্ষয়ে গেছে, কাঁচটা অবাধে নড়ছে। আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে পুটিন ভাঙছে ও। তারপর কাঠের ফ্রেমের তলায় ছুরির ফলা ঢুকিয়ে চাড় দিল। কাঁচটাকে ফ্রেম থেকে বের করে তুলে আনতে কোন সমস্যাই হলো না।

এই সময় ডক্টর ল্যাজারাসের নিতম্বে আরও একটা লাথি মারল কবীর চৌধুরী। এবার শব্দটাও শুনতে পেল রানা—খটাং! কবীর চৌধুরী অভিযোগ করল, 'এ তো দেখছি শুধুই হাড়! আমার পা-টাই না ভেঙে যায়!'

জবাব না দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এসে লেজ সোজা করার অসম্ভব কাজটায় আবার হাত লাগাল ডক্টর ল্যাজারাস। নিচু গলায় বলল, 'স্যার, আমাকে কি এবারের মত ক্ষমা করা যায় না?'

কবীর চৌধুরী নির্বিকার, আপনমনে পায়চারি করছে, ল্যাজারাসের কথা যেন শুনতে পায়নি।

সহানুভূতির সুরে ল্যাজারাসের হয়ে সুপারিশ করল মাফিয়া চীফ প্রক্টর। 'মিস্টার চৌধুরী, দিন, এবারের মত ক্ষমা করে দিন। হাজার হোক ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। তাছাড়া, আপনার বন্ধুও বটেন...'

'গ্রেগরি,' পায়চারি থামিয়ে তিরস্কার করল কবীর চৌধুরী, কামরার ভেতর তার ভারী গলা গমগম করে উঠল, 'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না, বুঝলে! কে আমার বন্ধু? নর্দমার এই কীটটা? গড, সেভ মি!' শেক্সপিয়ারিয়ান অভিনেতার মত সিলিঙের দিকে মুখ করে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল সে। 'তুমি

জানো, মানবতার কত বড় শত্রু ও? যে গর্হিত অপরাধ ও করেছে, নরকেও ওর ঠাঁই হবে না? জানো, ওকে আমি কি ধরনের বিপদের মুখ থেকে তুলে এনে নিরাপত্তা আর আশ্রয় দিয়েছিলাম?

'ও একজন সার্ব, বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের জন্যে ছিল স্রেফ একটা বিভীষিকা। পেশায় সাইকিয়্যাট্রিস্ট, অথচ দাঙ্গার সময় নিষ্পাপ, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ধরে এনে তাদের প্রাইভেট পার্টস কাটাছেঁড়া করত এক্সপেরিমেন্টের নামে। নরাধম, স্রেফ একটা নরাধম! যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার জন্যে আন্তর্জাতিক আদালত ওকে খুঁজছে।'

'আমি যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি,' বলল প্রক্টর, সকৌতুক হাসিটা লেগেই আছে মুখে। 'এতই যদি খারাপ উনি, আপনি তাঁকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিলেন কেন?'

'আমি সার্বিয়ায় গিয়েছিলাম ব্ল্যাকমার্কেট থেকে ইউরেনিয়াম কিনতে। কিভাবে যেন খবর পেয়ে দেখা করতে এল। ঘরে ঢুকে আছড়ে পড়ল পায়ের ওপর, একটুর জন্যে ডান পা-টা ভাঙেনি। বলে কিনা, আমি তার প্রাণ রক্ষা করলে আমার আন্ডারে সারাজীবন বিজ্ঞানের সাধনা করবে। শুধু তাই নয়, চিরকাল আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকারও শপথ নেয়। তখন বলেছিল, জীবনে ভুলেও কখনও কোন নাবালিকার দিকে হাত বাড়াবে না। অথচ নিসে ঠিক তাই করেছে হারামজাদা; একটুর জন্যে ফিলিপার সর্বনাশ করতে পারেনি। এতবড় একটা উজবুক আর অকৃতজ্ঞ শয়তানকে তুমি আমার বন্ধু বলো?'

'অপরাধ কি ওঁর এই একটাই, মিস্টার চৌধুরী?' জানতে চাইল প্রক্টর।

'ওর ভয়ে মেয়েটা ভিলা থেকে পালায়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক আছে, ওর এই অপরাধ আর গাফলতি নাহয় ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু মেয়েটাকে পরে আবার মাসুদ রানার হাতে তুলে দিয়েছে ও। মাসুদ রানা কে জানো? শুক্রর জ্বালা যেমন সূর্য,

আমেরিকার জ্বালা যেমন কিউবা, আল গোরের জ্বালা যেমন বুশ, আমার জ্বালা তেমনি মাসুদ রানা। সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু হতে পারত, হতে পারত আমার স্নেহধন্য অন্ধ ভক্ত; আমিও হতে পারতাম তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, আদর্শ গুরু এবং উদার প্রশ্রয়দাতা। কিন্তু—বাম বাম বাম!' ঘরের ভেতর যেন পরপর তিনটে বোমা ফাটল। 'বিধি বাম! নিয়তির বিধান, মাসুদ রানা আমার জান কবচ করার জন্যে সারাজীবন ধাওয়া করবে! এহেন পরম শত্রুকে হারামখোর ল্যাজা জানিয়ে এসেছে সোনার পাহাড়ে হাত পড়েছে আমার। এখন তুমিই বলো, প্রক্টর, ওকে আমি কিভাবে ক্ষমা করি? সুপারিশ করার আগে মনে রেখো, আমার দু'জন বডিগার্ড আর একজন অপারেটরকে খুন করেছে মাসুদ রানা। সেজন্যেও ওই ল্যাজাই দায়ী। এবার ফিলিপার কাছ থেকে সব খবর জেনে নিয়ে মাসুদ রানা এখন আমার পিছু নেবে, এতেও কোন সন্দেহ নেই।' চুরুটে ঘন ঘন টান দিল, কিন্তু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না দেখে অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল সেটা। 'হাভানার বাক্সটা নিয়ে আসি, ফিরে এসে তোমার জবাব শুনব,' বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল কবীর চৌধুরী।

কবীর চৌধুরী বেরিয়ে যেতেই কুকুরটাকে ছেড়ে সিধে হলো ডক্টর ল্যাজারাস, ব্যথাবেদনা ভুলে মাফিয়া চীফের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসল, তারপর অভয় দেয়ার সুরে বলল, 'চিন্তা করবেন না, ডন প্রক্টর। রাগ পড়ে গেলে মিস্টার চৌধুরী অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন, দেখবেন আবার আমি তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠব।'

'কি জানি,' ঠোঁট উল্টে বলল প্রক্টর। 'আপনার ভবিষ্যৎ অতটা উজ্জ্বল বলে তো মনে হচ্ছে না আমার।'

'ক্ষমা পাব, পাবই পাব,' দৃঢ় গলায় বলল ডক্টর ল্যাজারাস। 'কারণ, আমাকে মিস্টার চৌধুরীর দরকার।' কাঁচাপাকা গোঁফে তা দিল। 'দরকার এই জন্যে যে হিউম্যান বডির ভাইটাল পার্টস-এর একটা বাজার আছে, বাজারের চাহিদা আমার সাহায্যে পূরণ

করেন মিস্টার চৌধুরী। হে-হে, এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না, প্লীজ।'

'আপনাদের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই, ডক্টর ল্যাজারাস,' বলল প্রক্টর। 'তবে আপনার মত সম্মানী একজন ব্যক্তিকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে সত্যি আমি খুব মর্মাহত বোধ করছি...'

আর কিছু শোনার আগ্রহ নেই রানার, খোলা স্কাইলাইট থেকে লাফিয়ে নিচে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। হাড়-গোড় ভাঙার ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না, সিদ্ধান্ত নিল ঘরে কোন সোফা না থাকায় সরাসরি ল্যাজারাসের পিঠের ওপর নামবে। ফ্রেম থেকে খোলা কাঁচটা আগেই ছাদের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছে, এবার সাবধানে স্কাইলাইটের উঁচু কিনারায় উঠে বসল। লাফ দিতে যাবে, এই সময় গলায় শক্ত হয়ে এঁটে বসল একটা ধাতব চেইন। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে এল। বাতাসের অভাবে ছটফট করছে, তারপরও ওয়ালথারটা হাতে পাবার জন্যে জ্যাকেটের ভেতর একটা হাত গলিয়ে দিল। কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে অসাড় হয়ে আসছে শরীর। জিভটা বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে। চোখে এত ব্যথা, মনে হলো বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। চেইনের দুই প্রান্তে কাঠের দুটো হাতল আছে; পিছনে দাঁড়ানো লোকটা সেগুলো দু'দিকে টানছে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করছে ওর প্রাণ বায়ুকে। কিন্তু তারপরও শোল্ডার হোলস্টারে পৌঁছে গেল হাতটা।

'বোকামি করবেন না, প্লীজ,' পিছন থেকে বাংলায় বলল লোকটা। আরেকজন লোক ওর হাত দুটো ধরে পিছন দিকে টেনে নিল। 'মিস্টার কবীর চৌধুরী দাওয়াত দিয়েছেন আপনাকে। আমাদের কাজ শুধু নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁর সামনে আপনাকে হাজির করা।'

সার্চ করে পিস্তল আর ছুরিটা কেড়ে নিল ওরা। এবার ঢিল

পড়ল চেইনে। গলায় হাত বুলাচ্ছে রানা, ধীরে-ধীরে স্কাইলাইট থেকে ছাদের মেঝেতে নামল। নামার সময় নিচে চোখ পড়তে দেখল, কামরার মেঝে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কবীর চৌধুরী। চোখাচোখি হতে হাসল সে, হাত দুলিয়ে বলল, 'হাই, রানা! হাউ আর ইউ?'

নয়

দু'জনই ওরা বাঙালী, হাতে একটা করে পিস্তল। ওরা নাদিম ও হাবিব, ফ্রান্স থেকে সম্ভবত আজই নিউ ইয়র্কে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে রানাকে নামিয়ে এনে দীর্ঘ কয়েকটা করিডর হয়ে এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিঙে চলে এল। তারপর একটা কামরায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওকে।

কামরাটা লম্বা, মেঝেতে কার্পেট নেই, আসবাব বলতে কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল। রানার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল শুধু নাদিম। টেবিলে ওর ল্যুগার আর ছুরিটা রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। টেবিলের ওদিকে দুটো চেয়ারে বসে রয়েছে কবীর চৌধুরী ও মাফিয়া চীফ ডন প্রক্টর।

রানাকে দেখে কবীর চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এসো, রানা,' বলে এগিয়ে এসে রানার কাঁধে হাত রাখল। হাঁটছে সে, কাজেই রানাকেও হাঁটতে হচ্ছে। 'কাজের কথা পরে, তার আগে বলো—তুমি আছ কেমন? সব খবর ভাল তো?' রানা নির্লিপ্ত, কথা বলছে না।

'টোপ গিলে ধরা পড়ে গেছ, সেজন্যে মন খারাপ?' নরম সুরে প্রশ্ন করে হাসল কবীর চৌধুরী। 'মেসেজটা আমিই ফ্লয়িড ডকিংকে দিয়ে লেখাই। জানতাম ক্লুর খোঁজে ওই ফ্ল্যাটেই তুমি প্রথমে যাবে। সুখলালের বাক্সটা খোলা সহজ নয়, তাই চিরকুটটা ওটায় ভরে রেখে আসি সহজে পাওয়া মেসেজ টোপ বলে সন্দেহ করবে তুমি, তাই।'

চিরকুটটা টোপ হতে পারে, এই সন্দেহ হয়েছিল রানার, তবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। কাজ করতে গেলে ভুল তো কিছু হবেই, নিজেকে তিরস্কার করে কোন লাভ নেই।

'তোমার বুদ্ধির ধার কি কমে যাচ্ছে, রানা?' কামরার শেষ প্রান্তে পৌঁছে রানাকে নিয়ে ঘুরল কবীর চৌধুরী, ধীর পায়ে ফিরে আসছে আবার।

এতক্ষণে ডক্টর ল্যাজারাসকে দেখতে পেল রানা। সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে সে। ভাল করে তাকাতে তার নাকের সামনে একটা কয়েন দেখতে পেল রানা, কয়েনটা রাখা হয়েছে সাদা চক দিয়ে তৈরি একটা সরল রেখার ওপর। রেখাটা কামরার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে টানা হয়েছে। ডক্টর ল্যাজারাস নাকের ডগা দিয়ে কয়েনটা ঠেলছে। রেখাটা খুব সরু, নাকের ঠেলা খেয়ে রেখার বাইরে বেরিয়ে আসছে কয়েন। যতবার বেরুচ্ছে, ততবার স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে তাকে।

'প্রশ্নটা এই জন্যে করছি,' নিজের কথার খেই ধরে আবার বলল কবীর চৌধুরী, 'স্কাইলাইটের কাঁচটা যখন সরালে তুমি, এ-কথা ভাবলে না যে কামরার ভেতর তাজা বাতাস ঢুকবে? নতুন বাতাস, যত সামান্যই হোক, আমার নাক দিয়ে বেরুনো চুরুটের ধোঁয়াকে ডিসটার্ব করবে, এই কথাটা তোমার মাথায় ঢুকল না?' আবার হাসল সে। 'এর আগেও ধোঁয়ার এই দিক পরিবর্তন আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। দুনিয়ায়

অল্প যে-ক'জন লোক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ধূমপান করে, তাদের মধ্যে আমি একজন।'

রানার ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'বেশি কথা বলার বদভ্যাসটা আজও তোমার গেল না। এমনও তো হতে পারে, ওটা টোপ ছিল জেনেই এখানে আমি এসেছি, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে আমি না ফিরলে এফবিআই ডন প্রক্টরের এই হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলবে?'

রানা থামতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। তারপর বলল, 'ডন প্রক্টরকে তুমি উত্তেজিত করতে চাইছ। চাইছ আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে। কিন্তু বিজনেস পার্টনার হিসেবে পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করি, রানা। আমাদের বন্ধুত্ব পারস্পরিক স্বার্থের পরিপূরক, কাজেই এতে চিড় ধরানো সম্ভব নয়। এফবিআই?' আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'এফবিআইকে আমরা ভয় পাই না, রানা। কেন ভয় পাই না, ডন প্রক্টরের মুখেই শোনো। এসো, তার আগে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রক্টর, এর কথা আগেই তোমাকে বলেছি—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন, যাকে বন্ধু হিসেবে চেয়ে না পেলেও এখনও হাল ছাড়িনি, যার দেশপ্রেমকে আমি শ্রদ্ধা করি, যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে করি গর্ব বোধ—মাসুদ রানা, এসপিওনাজ এজেন্ট, কোড নেম এম আর নাইন। রানা, ওর নাম তো নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ, গ্রেগরি প্রক্টর...'

চেয়ার ছেড়ে হাতটা লম্বা করে দিল মাফিয়া চীফ। তার কোমরের বেল্টে একটা নয়, দু'দু'টো পিস্তল দেখতে পেল রানা। 'আপনি যদি মিস্টার চৌধুরীর বন্ধু হয়ে থাকেন, মিস্টার রানা, তাহলে আমিও আপনার বন্ধু।'

হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ইতিমধ্যে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ও, ফলে গতি বজায় রাখার জন্যে দ্রুত পা ফেলতে হচ্ছে কবীর চৌধুরীকে। মেঝেতে কার্পেট না থাকায় কাঠের পা খট-খট আওয়াজ করছে।

রানা লক্ষ করল, কামরার ছ'টা দরজার বেশিরভাগই খোলা, পর্দা থাকলেও প্রতিটি দরজার বাইরে সশস্ত্র লোকজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

হাতটা টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ারে আবার বসল প্রক্টর। চেহারা দেখে মনে হলো না অপমানটা গায়ে মেখেছে। 'আমি জানি আপনি রানা এজেন্সির ডিরেক্টর। আমি এ-ও জানি যে আপনার হাত হোয়াইট হাউস পর্যন্ত লম্বা। তবু, বিশ্বাস করুন, এ-সবের এক কানাকড়িও দাম দিই না আমি। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, আমার চাঁছাছোলা উত্তর হলো—এই মুহূর্তে যে ভাঁড়টা হোয়াইট হাউসে বসে আছে, ইলেকশনে জিততে আমি তাকে নগদ পাঁচ কোটি ডলার চাঁদা দিয়েছি; আর এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রবার্ট টেনিন হতে যাচ্ছে আমার বেয়াই, তার একমাত্র মেয়ে আমার পুত্রবধূ...'

'এবার কাজের কথা শুরু হোক,' প্রক্টরকে বাধা দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'মেয়েটা কোথায়, রানা?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কাঁধ থেকে কবীর চৌধুরীর হাতটা নামিয়ে দিল। 'না, কবীর চৌধুরী, ফিলিপাকে তুমি এর সঙ্গে জড়াবে না।'

'সে অনেক আগেই জড়িয়েছে, রানা। কোন কাজে খুঁত রাখা আমি পছন্দ করি না। মেয়েটাকে নিউট্রালাইজ না করাটা আমার জন্য বোকামি হবে।'

'জড়িয়েছে কোন্ অর্থে? সে তোমাদের কুকীর্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না।'

সাদা রেখা থেকে কয়েনটা সরে যেতে আবার নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছিল ডক্টর ল্যাজারাস, মেঝে থেকে রক্তাক্ত নাক তুলে বলল, 'মিস্টার রানা সম্ভবত ঠিকই বলছেন। ফিলিপাও আমাকে বলেছে যে তার বাপের সঙ্গে আপনার কি চুক্তি হয়েছে তা সে জানে না।' নিজের অপরাধ হালকা করার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে সে।

'বিনা অনুমতিতে কথা বলায় তোমার শাস্তি আরও বাড়ল,' ল্যাজারাসকে বলল কবীর চৌধুরী। 'টার্গেটে পৌঁছে দেয়ার পর কয়েনটা তোমাকে আধ গ্লাস পানির সঙ্গে গিলে খেয়ে নিতে হবে। আধ গ্লাস পানির সঙ্গে কি করতে হবে?' ল্যাজারাসের দিকে এক পা এগোল সে।

'গিলে খেয়ে নিতে হবে,' তাড়াতাড়ি পুনরাবৃত্তি করল ডক্টর ল্যাজারাস।

'গুড,' বলে রানার দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'দুঃখিত, রানা, আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। বুঝতেই পারছ, বড় একটা কাজ প্রায় শেষ করে এনে আমি বেশ খোশমেজাজে আছি। বলতে পার, রীতিমত হালকা মূডেই আছি। কিন্তু ওই মেয়েটাকে আমার চাই-ই চাই। এতদূর এসে সব হারাবার ঝুঁকি আমি...'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সে কোথায় আমি জানি না।'

একটা দরজার দিকে ফিরে হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'নাদিম! হাবিব!'

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে কামরায় ঢুকল দুই বডিগার্ড।

'চেয়ারে বসিয়ে বাঁধো ওকে!' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী, রাগে থরথর করে কাঁপছে।

'আমার কি বুঝতে ভুল হয়েছিল?' সকৌতুকে বলল মাফিয়া চীফ। 'আপনি তো দেখছি মিস্টার চৌধুরীর বন্ধু নন আপনি, শত্রু। তাহলে আমিও তো আর আপনার বন্ধু থাকতে পারি না।'

একটা চেয়ারে বসিয়ে হাত দুটো বাঁধা হচ্ছে, রানা খেয়াল করল কবীর চৌধুরীর রণমূর্তি দেখে আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে নাক দিয়ে কয়েনটা ঠেলছে ডক্টর ল্যাজারাস।

চেয়ারের সঙ্গে রানার পা-ও বাঁধা হলো। কাজটা সেরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল নাদিম ও হাবিব।

আলখেল্লার পকেট থেকে হাভানা চুরুটের একটা বাক্স বের করল কবীর চৌধুরী। চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে।

টেবিল থেকে রানার ছুরিটা তুলে নেড়েচেড়ে ফলাটা পরীক্ষা করল। দেশলাইয়ের আরেকটা কাঠি বের করল সে, বারুদবিহীন প্রান্তটা চেঁছে চোখা করছে। 'তোমাকে আমি নিষেধ করছি, রানা—আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না!'

'যা খুশি করো তুমি, আমার কিছু বলার নেই।' টরচার যখন করবেই, রানা চাইছে যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই ভাল। নির্যাতনের একটা পর্যায় আছে, যেটা অতিক্রম করলে শরীর থেকে পাঠানো বার্তা মস্তিষ্ক আর গ্রহণ করে না, এমন কি ভিক্টিম সচেতন থাকা সত্ত্বেও। নাগালের বাইরে ধু-ধু এক প্রান্তরে ভেসে বেড়ায় মন, মুক্ত ও নিরাপদ। রানা এখন ভাবছে, সেই প্রান্তরে পৌঁছে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়, সকালে রানা এজেন্সির অপারেটররা ওর নির্দেশ মত হানা দেবে প্রক্টর মলে।

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। ঝুঁকল সে, দেশলাইয়ের চোখা কাঠিটা ওর ডান হাতের মধ্যমা আঙুলের নখের ভেতর ঢোকাল। মুখের চুরুট নামিয়ে বারুদে ধরতেই ফস করে জ্বলে উঠল সেটা।

দেশলাইয়ের কাঠি পুড়ে ছাই হচ্ছে। এবার ছুরির চোখা ডগাটা রানার বাঁ চোখের সামনে ধরল কবীর চৌধুরী, এত কাছে যে নড়লেই খোঁচা লাগবে। 'নোড়ো না,' সাবধান করল সে। 'কারণ নড়লেই তোমার এই চোখটা ইস্পাতের টুথপিকে আটকানো একটা জলপাই-এর মত দেখাবে।'

দেশলাইয়ের কাঠিটাকে পুড়ে ছোট হতে দেখছে রানা।

'মেয়েটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

আঙুলের চামড়ায় গরম আঁচ পাচ্ছে রানা।

'নোড়ো না কিন্তু!' আবার সতর্ক করল কবীর চৌধুরী।

ব্যথাটা এবার অসহ্য লাগছে রানার। অনুভব করল পেশিগুলোয় টান পড়ল, নিজে থেকেই কাঁপছে ওগুলো। ওর চোখের সামনে ছুরিটা স্রেফ ঝাপসা একটা আকৃতি।

তারপর হঠাৎ করেই খালি হাতটা বাড়িয়ে কাঠিটা নিভিয়ে ফেলল কবীর চৌধুরী, ছুরিটাও সরিয়ে নিল। 'তুমি যে প্রফেশ্যনাল, সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, রানা। আসলে এই টরচারকে তুমি শাপে বর বলে মনে করছিলে, তাই না? তুমি জানো বিশেষ একটা স্তর পার হয়ে মনটা একসময় শূন্যে ভাসবে, নিজেকে মনে হবে পরিত্যক্ত, কোন অনুভূতিই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' হেসে উঠল সে। 'আমি তোমার মনের কথা পড়তে পারি, রানা।'

'যথেষ্ট হয়েছে, মিস্টার চৌধুরী,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাফিয়া চীফ। 'ছেলেমানুষি খেলা আজকের মত বাদ দিন।'

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল কবীর চৌধুরী। 'দুঃখিত, প্রক্টর। সত্যি, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আজ রাতে অনেক কাজ আমাদের।'

'ছুরিটা দিন আমাকে,' বলল প্রক্টর।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নত করে প্রক্টরের হাতে রানার ছুরিটা তুলে দিল কবীর চৌধুরী।

সেটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল প্রক্টর। তারপর নীল চোখ তুলে হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনি আমাকে বলবেন মেয়েটা কোথায় আছে।' টেবিল ঘুরে ডক্টর ল্যাজারাসের দিকে এগোল সে। তার কাঁধে হাত রেখে ইঙ্গিতে দাঁড়াতে বলল। ডক্টর ল্যাজারাস দাঁড়াতে তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল প্রক্টর। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ল্যাজারাস, তারপর একটা খোলা দরজার দিকে পা বাড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?' বাঘের মত গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাজারাস, অসহায় ভঙ্গিতে সাহায্যের আশায় তাকাল প্রক্টরের দিকে। প্রক্টর বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, যা হবার হয়েছে, এবারের মত ডক্টর ল্যাজারাসকে ক্ষমা করে দিন।'

'শপথ করিয়েই' কবীর চৌধুরী বিরক্ত

'ওহ্, তাই তো! হাসপাতালে ছাড়া সব মানুষ ঠিক আছে, সংক্ষেপে সারুন, মিস্টার চৌধুরী, প্লীজ'

নির্দেশ দিতেই প্রহরীর একজন বাড়িগার্ড দশ মিনিটের মধ্যে রাইবেলের বুলেট একটা সংস্করণ এনে দিল। টেবিলে রাখা হলো সেটা, তার ওপর ডান হাতটা রেখেছে ল্যাজারাস

কবীর চৌধুরী শপথ বাক্য পাঠ করলেন। সে অনুচ্চ কণ্ঠে যা বলল ল্যাজারাস উচ্চকণ্ঠে তাই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। 'কবীর চৌধুরী আমার অন্ন ও আশ্রয় দাতা। তিনি মহৎ; মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ; এবং বিরল এক প্রতিভা। তিনি আমার পরম গুরু, আমি তাঁর অনুগত ভৃত্য। তিনি আমাকে ছোট মেয়েদের প্রতি দুর্বল হতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু সেই নির্দেশ আমি লঙ্ঘন করি, তাই নিজেকে আমার কুকুরের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে। আজ আবার নতুন করে আমি শপথ নিচ্ছি- আর কখনও তাঁর কোন নির্দেশ অমান্য করব না; যদি করি, কবীর চৌধুরী আমার ডান হাতটা কেটে নিতে পারবেন এবং, কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ, আমি স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে, কারও দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে, মহামান্য কবীর চৌধুরীকে অনুরোধ করছি আমার একদিকের গোঁফ যেন তিনি এই মুহূর্তে কেটে নেন।'

এরপর একটা কাঁচি আনিয়ে সত্যি সত্যি ডক্টর ল্যাজারাসের অর্ধেকটা গোঁফ কেটে নিল কবীর চৌধুরী।

গোঁফের শোকে চোখ থেকে এক কি দু'ফোঁটা পানি ফেলল ল্যাজারাস, তারপর আহত পশুর মত গোঙাতে গোঙাতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিট পরই ফিরে এল সে। প্রহরীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

ভাব দেখে মনে হলো কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। অথচ কি ঘটবে তার কোন ধারণা নেই।

কবীর চৌধুরী চেয়ারে বসে মেঝেতে মৃদু শব্দে ছড়ি ঠুকছেন।

ফিরে আসার পর ডক্টর ল্যাজারাস দাঁড়িয়েছে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, চোরা চোখে টেবিলে পড়ে থাকা কাচিটার দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে সে—হয়তো ভাবছে সুযোগ পেলে গোঁফের বাকি অর্ধেকটা কেটে ফেলবে।

হাত-পা বাঁধা রানা চেয়ারে বসে আছে শিরদাড়া খাড়া করে; শান্ত ও গম্ভীর।

প্রক্টর এবং মনে আবার পরীক্ষা করছে হাতের ছুরিটা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি।

সাত কি আট মিনিট পর একটা দরজায় নক হলো।

কে? ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল প্রক্টর।

'আলবার্ট।'

ঠিক আছে, বলল প্রক্টর।

বিস্ফোরিত হলো দরজা, মাঝারি আকৃতির একটা মূর্তিকে সবেগে ছুঁড়ে দেয়া হলো কামরার ভেতর। শক্ত মেঝেতে ভারী একটা বস্তার মত পড়ল রক্ত-মাংসের জ্যান্ত মানুষটা, রানার ঠিক পায়ের সামনে। লোকটার কাপড়চোপড় ছেঁড়া, রক্তাক্ত। চোখের চশমায় একদিকের লেন্স নেই। বিধ্বস্ত ও করুণ হলেও, ফটোয় দেখা চেহারাটা চিনতে পারল রানা। ইনি ফিলিপার বাবা, ফ্লয়িড ডাকিং।

চিনতে পারছেন তো, মিস্টার রানা? জিজ্ঞেস করল প্রক্টর।

রানা জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

কবীর চৌধুরী বলল, প্রক্টর, মনে রেখো মিস্টার ডাকংকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে।

চিন্তা করবেন না, আশ্বস্ত করে বলল প্রক্টর। আপনার প্ল্যানটা কি আমি জানি। আপনি ওঁকে পাবেন—মানে, ওঁর বেশিরভাগটাই।

বেশ, বেশ, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। সন্তুষ্ট দেখাল কবীর চৌধুরীকে।

হাতের কাছে মেডিকেল সাপ্লাই কিছু আছে নাকি, ডক্টর

ল্যাজারাস?' জিজ্ঞেস করল প্রক্টর।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' উৎসাহে প্রায় নেচে উঠল ল্যাজারাস।

'তাহলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। আমার কিছু প্রেশার ব্যান্ডেজ আর টুর্নিকেই দরকার। ও, হ্যাঁ, ওঁকে জাহাজে নিয়ে তুলতে তো দেরি আছে, কাজেই খানিকটা মরফিনও লাগবে। আর রক্ত বন্ধ করার জন্যে যা ভাল মনে করেন নিয়ে আসুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডক্টর ল্যাজারাস।

জাহাজের কথা শুনে রানার চোখ চুল পরিমাণ বড় হলো, লক্ষ করে কবীর চৌধুরী হেসে উঠে বলল, 'রানা, এ-কথা ভেবো না যে আমাদের অসর্তকতার কারণে গোপন কিছু শুনে ফেলেছ। খানিক পর জাহাজটা তুমিও দেখতে পাবে।'

ছোট একটা কালো ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এল ডক্টর ল্যাজারাস।

ফ্লয়িড ডকিং বেঢপ একটা বস্তার মত মেঝেতে পড়ে আছেন, মাঝেমধ্যে কাতর কণ্ঠে গোঙাচ্ছেন। তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল প্রক্টর, হাত দিয়ে ঠেলে চিৎ করল শরীরটা। ডাঙায় তোলা মাছের মত তাঁকে খাবি খেতে দেখল রানা।

বাঁ হাত বাড়িয়ে তাঁর দুই চোয়ালের গোড়া শক্ত করে চেপে ধরল প্রক্টর, চাপ বাড়িয়ে হাঁ করতে বাধ্য করল। তারপর মুখের ভেতর ভরে দিল ছুরির ফলা। ছুরিটা বাঁকা করল সে, নরম মাংসে ফলার চাপ লাগায় মুখের বাইরে ফুলে উঠল একদিকের গাল। রানার দিকে তাকাল প্রক্টর। 'মিস্টার রানা, আপনি যদি আমার ছুরির খেলা দেখতে চান, তাহলে প্রশ্ন শুনেও চুপ করে থাকবেন। আর চুপ করে থাকলে মিস্টার ডকিঙের গাল চিরে দেব আমি। তারপর আবার প্রশ্ন করব। উত্তর চাই দ্রুত ও সঠিক।'

কবীর চৌধুরীর মুখে হাসি উপচে পড়ছে। কথা বলাবার পদ্ধতিটা অসম্ভব ভাল লাগছে তার।

'আপনার উত্তর যদি আমার পছন্দ না হয়, ভদ্রলোকের

খানিকটা মাংস কেটে নেব। তারপর শুরু করব মুখের আরেকদিকে,' আবার শুরু করেছে প্রক্টর। 'এরপর একে একে কান ও নাক হারাবেন উনি। একটা চোখ হারাবেন, হারাবেন একটা হাত। অপর হাতের আঙুলগুলো। গোটা একটা পা। না-না, রক্তক্ষরণে ওঁকে মরতে দেয়া হবে না, ডক্টর ল্যাজারাস রোগীকে বাঁচিয়ে রাখবেন। তবে একটা পর্যায়ে, যতই চেষ্টা করুন ডাক্তার, ব্যান্ডেজ করার মত কোন জায়গাই তিনি পাবেন না। মিস্টার ডকিঙের সেই অবস্থার জন্যে দায়ী হবেন আপনি। কাজেই, তাঁর ভবিষ্যৎ আপনার ওপর নির্ভর করছে। এখন বলুন, মেয়েটা কোথায়?'

কঠিন সমস্যায় পড়ে গেল রানা। ও জানে, গ্রেগরি প্রক্টর মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। একবার ভাবল, ফিলিপাকে এদের হাত থেকে দূরে রাখার পরিবর্তে ফ্লয়িড ডকিংকে যদি মরতে দেখতে হয়, দেখবে। মেয়ের প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসার কারণে নিজ দেশের বিপুল সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন তিনি; কোন না কোন শাস্তি তো তাঁকে পেতেই হবে। বেঁচে গিয়ে সারাজীবন জেলের ঘানি টানার চেয়ে মরে যাওয়া কি তাঁর জন্যে ভাল নয়?

তারপর সিদ্ধান্ত নিল, ও চায় না ওর উপস্থিতিতে ফ্লয়িড ডকিংকে প্রক্টর বা কবীর চৌধুরী খুন করুক। ডকিং খুন হবার পরও যখন উত্তর পাবে না, ওরা তখন আবার ওকে ধরবে। 'ফিলিপা একটা সেইফ হাউসে আছে,' বলল ও।

'সেটা আগেই আমরা অনুমান করেছি।' চেয়ার থেকে বলল কবীর। 'কিন্তু কোথায় সেটা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোথায় তা আমিও জানি না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। 'তুমি না জানলেও রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা অবশ্যই জানে। ফোন করো ওখানে, নির্দেশ দাও ফিলিপাকে সেইফ হাউস থেকে বের করে জাতিসংঘ

ভবনের সামনে নিয়ে আসুন।'

রানা ভাব দেখাল ইতস্তত করছে।

'মিস্টার রানা, আপনি কিন্তু আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন।' হুমকির সুরে বলল পিটর।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, অসহায় দেখাচ্ছে। 'একটা মোবাইল ফোন দাও আমাকে।'

'তবে রানা, ফোন করে তুমি শুধু সিসিলিয়াকেই চাইবে না,' বলল কবীর চৌধুরী, 'তোমার এজেন্টকে এই নির্দেশও দেবে যে তারা যেন ভুলেও আমাদের লোককে অনুসরণ না করে, পুলিস বা এফবিআইকেও যেন খবর না দেয়...'

'মোটকথা, আমাদের পছন্দ হবে না এমন কিছু করতে পারবে না ওরা,' বলল পিটর, 'করলে আপনি মারা যাবেন।'

তিক্ত হেসে রানা কবীর চৌধুরীকে প্রশ্ন করল, 'তোমার প্ল্যানে তাহলে আমার বেঁচে থাকার সুযোগও আছে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে পরে দেব না, তার আগে আমার প্রিয় বন্ধু পিটর তার কাজ শেষ করুক।'

'আলবার্ট,' ডাক ছাড়ল পিটর, 'একটা মোবাইল ফোন দাও আমাকে।'

দশ

জাতিসংঘ ভবনের সামনে থেকে সিসিলিয়াকে নিয়ে ফিরার জন্যে আটজনের একটা সশস্ত্র দল বিশটা গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ওদের মধ্যে চারজন কবীর চৌধুরীর লোক, বাকি চারজন সাফিয়া ডন প্রক্টরের ব্যক্তিগত বাহিনীর যোদ্ধা। ওদেরকে লেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হলে বাকি ত্রিজেনিয়ার প্রজেক্টরা একজনও যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে, এমনকি ফিলিপাকেও বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। ওদের সঙ্গে রাইফেল ও পিস্তল ছাড়াও দুডজন হ্যান্ড গ্রেনেড আছে। কবীর চৌধুরীর নির্দেশ অনুসারে ফিলিপাকে নিয়ে তারা এখানে আর ফিরবে না, সরাসরি জাহাজে গিয়ে উঠবে।

লোকগুলো চলে যাবার পর কবীর চৌধুরীকে চিন্তিত দেখাল। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল সে। কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ডিভোর অফিসরুমে গিয়ে বসেছে প্রক্টর, সঙ্গে ল্যাজারাস গেছে।

'আ পেনি ফর ইওর থটস,' কৌতুক করার লোভটা রানা ছাড়তে পারল না।

ওর দিকে তাকিয়ে কবীর চৌধুরী গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমাকে আমি চিনি, রানা। ভাওয়ে, তবু মানবে না। কিন্তু আজ তুমি খুব সহজে পরাজয় স্বীকার করে বসলে। একটু চাপ দিতেই ফিলিপাকে তুমি আমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে গেলে। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।

রানা হাসল। কেন? আটজন লোককে তোমার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া উচিত হয়নি। নিজের চারজন লোককে হারাতে হলে ডন প্রক্টর তোমার বন্ধু থাকতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ।

বন্দী অবস্থায় আমাকে ব্যঙ্গ করছ, রানা? শুধু তোমাকেই মানায়, পায়চারি থামিয়ে রানার চেয়ারের সামনে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। এখনও অমর আছে রানা। দরকার হলে ফোনটা আবার ব্যবহার করো, তোমার লোকদের বলো তারা যেন কোন রকম বোকামি না করে...

এবার রানাকেও সিরিয়াস দেখাল। 'নিজেকে আমি ভালবাসি, কবীর চৌধুরী। আর ফিলিপার কথা যদি বলো, তার সঙ্গে আমার একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি হয়েছে, আমি তাকে খুবই স্নেহ করি। কাজেই যদি ভেবে থাকো তোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে ওর প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছি আমি, তোমার সেটা ভুল হবে।'

'সত্যি বলছ? তোমার এজেন্টরা এফবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না?' কবীর চৌধুরী রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমাদের সামনেই তো ফোনে ওদেরকে নিষেধ করলাম,' বলল রানা। 'তবে একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এফবিআইকে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? প্রক্টর তোমার বন্ধু, আর এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্রক্টরের বেয়াই হতে যাচ্ছেন...'

'এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে,' বিড়বিড় করল কবীর চৌধুরী, আবার পায়চারি শুরু করেছে। 'প্রক্টরের ছোট ছেলেটা মিস্টার টেনিনের মেয়েটাকে হেরোইন সাপ্লাই দেয়...' হঠাৎ চুপ করে গেল সে, পরমুহূর্তে পর্দা সরিয়ে কামরায় ফিরে এল প্রক্টর ও ডক্টর ল্যাজারাস।

'আপনার জাহাজ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে পারবে, মিস্টার চৌধুরী,' বলল প্রক্টর। 'আরও বেশি লোক লাগাতে বলেছি ওদেরকে, মাল তোলার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়।'

'ধন্যবাদ, প্রক্টর, অসংখ্য ধন্যবাদ।' কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে সন্তুষ্টির হাসি। 'তোমার এই সহযোগিতা চিরকাল মনে রাখব আমি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'এবার, রানা, তোমার প্রশ্নটার উত্তর দেয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, আমার প্ল্যানে তোমার বেঁচে থাকার সুযোগ একটা সত্যি আছে। আমি তোমাকে দুটো প্রস্তাব দিচ্ছি। এক, পালাবার চেষ্টা করে গুলি খেয়ে মরো। দুই, বন্দী জীবন

মেনে নাও।'

'ঠিক কি বলতে চাও?'

'গত কয়েক বছর ধরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নিয়ে চীনে কাজ করছি আমি, রানা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওই প্রজেক্টের কথা একদিন তুমিও শুনতে পাবে, আর শোনামাত্র ওটা ধ্বংস করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে। সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না, রানা। সেজন্যেই তোমাকে আমি সঙ্গে করে চীনে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে তুমি কিছুদিন আমার অতিথি হিসেবে থাকবে।'

'তুমি একা নও, মিস্টার ডকিং আর তার মেয়েও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ডকিংকে নিচ্ছি, কারণ চীনে আমাদের একটা নতুন ভল্ট দরকার হবে।'

'মিস্টার চৌধুরী, স্যার,' বারকয়েক কেশে প্রশ্ন করল ডক্টর ল্যাজারাস, 'আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলেন দয়া করে বলবেন?'

'তোমার তো আর ফ্রান্সে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওখানকার স্বার্থ দেখার জন্যে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেব আমি। চীনে তোমার কোন কাজ...আছে, ওখানেও তোমার কাজ আছে! চীনা নেতারা অনেকেই বাতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু আমার সময় কোথায় যে তাদের চিকিৎসা করব। ইয়াং চু মারা যাওয়ায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, ভাবছি তোমাকে দিয়েই সেটা পূরণ করব। ব্ল্যাক উইডোর সাপ্লাই ঠিক থাকলে চীনা নেতাদের বাত সারিয়ে দিয়ে প্রচুর নাম কিনতে পারবে তুমি। তবে একটা কথা, চীনে থাকতে হলে হেরোইনের নেশাটা তোমাকে ছাড়তে হবে, ল্যাজা।'

'স্যার!' হাতজোড় করে কবীর চৌধুরীর সামনে দাঁড়াল ডক্টর ল্যাজারাস। 'আপনি মহান! কথা দিচ্ছি আপনার এই উদারতার ঋণ প্রাণ দিয়ে হলেও পরিশোধ করব আমি।'

'আমি আনুগত্য পছন্দ করি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ঘৃণা করি

বেঈমানী। আমার কথামত চললে ভবিষ্যতে কখনোই কোন সমস্যায় পড়তে হবে না তোমাকে।'

'মহাত্মা, আমি শুধু বংশানুক্রমে আপনার ক্রীতদাস' হয়ে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করছি!' শ্রদ্ধায় ও বিনয়ে ল্যাজারাসের সারা শরীর কাঁপছে।

'এভাবে কোটি যদি আত্মসমর্পণ করে, তাকে ক্ষমা না করে পারা যায় না,' বলল কবীর চৌধুরী, তারপর যেন সমর্থন পাবার আশায় প্রফেসরের দিকে তাকাল। তাকে পুরস্কৃত করা ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কি বলো, প্রফেসর?'

'আমি কি বলব,' বলল মাকিয়া চীফ। প্রাচ্য দেশীয় এই ভাবাবেগ আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ও নতুন। আমার মনে হচ্ছে এখানে ভাঁড়ামি আর বেহায়াপনার প্রতিযোগিতা চলছে, তবে নিশ্চয় তা সত্যি নয়।'

'না, সত্যি নয়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমার প্রতি ডক্টর ল্যাজারাসের ভক্তি নির্ভেজাল। এই ভক্তি পুরস্কার পাবার যোগ্য।'

প্রত্যাশা ও লোভে ল্যাজারাসের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'স্যার!'

'যে কারণে তোমাকে শাস্তি পেতে হয়েছে,' বলল কবীর চৌধুরী, 'সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটা আমাদের কোন কাজে লাগবে না। চীনে পৌঁছে তাকে আমি তোমার হাতেই তুলে দেব, ল্যাজা।'

চোখের পলকে হুমড়ি খেয়ে কবীর চৌধুরীর পদচুম্বন করল ল্যাজারাস। আহ্লাদে কেঁদে ফেলল সে।

প্রফেসরের ঠোঁটে খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা যাচ্ছে। বলল, 'সবাই কিছু না কিছু উপহার পাচ্ছে। আমাকে কিছু দেবেন না, মিস্টার চৌধুরী?'

'নিশ্চয়ই, বুক চিরে কলজেটা ও তোমাকে উপহার দিতে পারি,' উদার একটা ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'বলো, কি পেলে খুশি হও তুমি?'

আমাকে বলা হয়েছে মাসুদ রানা জীবন্ত একটা কিংবদন্তীর নাম। তিনি একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁকে আপনি বন্দী করে চীনে নিয়ে গেলে তিনি অতীত ইতিহাসে পরিণত হবেন। এহেন রানার ব্যবহার করা পিস্তল আর ছুরিটা যদি আমাকে দেন, ওগুলো আমি আমার মিউজিয়ামে অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেব।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী, 'ওগুলো আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার দিলাম, প্রফেসর।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার চৌধুরী।'

তিক্ত হেসে রানা বলল, 'বাজে জিনিস, আর কে উপহার দেয়...'

'ভুলে যেয়ো না, তুমি আমার বন্দী,' রানাকে বলল কবীর চৌধুরী। 'বন্দীর নিজস্ব জিনিস বলে কিছু থাকে না। এমনকি তুমি নিজেও আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা যখন উঠলই, তোমাকে আরেকটা তথ্য দিই, রানা। অবশ্য তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সব জেনে ফেলেছ। তথ্যটা হলো, যে জাহাজটা চীনে যাচ্ছে তাতে তুমিই আমার একমাত্র সম্পত্তি নও, তোমার সঙ্গে সাত হাজার টন সোনাও যাচ্ছে। আরও সাত হাজার টন লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি। মোট চোদ্দ হাজার টন সোনার মালিক এখন আমি।'

বন্দী রানা হাঁ-মুখে তাকিয়ে থাকল।

'ট্রাক এসে আমাদেরকে তুলে নেবার আগে হাতে খানিকটা সময় আছে,' বলল পাগল বিজ্ঞানী। 'তোমার যদি কোন কৌতূহল থাকে, আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, রানা।'

তাকে নয়, রানা প্রফেসরকে প্রশ্ন করল, 'তোমার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রফেসর। এটা তোমার দেশ, তুমি সপরিবারে এখানেই চিরকাল বসবাস করবে। এ দেশের এত বড় ক্ষতি তুমি মেনে নিচ্ছ কিভাবে?'

'আমাদের বন্ধুত্বে কাটল ধরাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই,

রানা!' হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'কারণ বন্ধুত্বটা পারস্পরিক স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সস্তা সেন্টিমেন্ট দিয়ে গ্রেগরি প্রক্টরকে টলানো সম্ভব নয়। প্রক্টর একজন ব্যবসায়ী, রানা। দেশপ্রেম নয়, ও হেরোইন বিক্রি করে। সোনার প্রতি ওর বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই। যে দুশো টন ওকে আমি দিয়েছি, সেটা শুভেচ্ছা আর সৌজন্যের প্রতীক হিসেবে।'

'বিনিময়ে প্রক্টর আর কিছু পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে হেরোইন। পরিমাণে এতটাই, বিক্রি করে চোদ্দ হাজার টন সোনা বাজার দরেই কিনতে পারবে ও। কি, ঠিক বলিনি, প্রক্টর?'

'শুধু তো নিউ ইয়র্কের নয়, গোটা আমেরিকার বাজার আমার একার দখলে চলে আসছে,' বলল প্রক্টর। 'দাম একটু চড়িয়ে বিক্রি করতে পারলে আরও বেশি সোনা কিনতে পারব।'

'এত হেরোইন তুমি পেলে কোথায়?' রানার প্রশ্নের সুরে অবিশ্বাস।

'এগারোই সেপ্টেম্বরের পর আমি আফগানিস্তানে চলে যাই, রানা,' বলে থেমে গেল কবীর চৌধুরী, যেন এ থেকেই রানা ওর প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

'আফগানিস্তানে প্রচুর হেরোইন আছে, এ সবাই জানে,' বলল রানা। 'কিন্তু সেই হেরোইন তোমার হাতে আসে কিভাবে? বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এক জায়গায় জড়ো করাটাই তো প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে তুমুল যুদ্ধের মধ্যে।'

'দেখলাম সবাই তালেবানদের ধাওয়া করছে,' বলল চৌধুরী। 'আমিও আমার বাহিনী নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলাম। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সৈনিকরা ব্যাংক লুঠ করল, অস্ত্র লুঠ করল, বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাল। আমি কি করলাম? ভান করলাম ওরা যা করছে আমরাও তাই করছি। আসলে তা করিনি। আমরা একটা কাজই করেছি, ট্রাক বহর ভর্তি করেছি হেরোইনে, তারপর সীমান্ত

পেরিয়ে, সাগর পাড়ি দিয়ে, নানা পথ ঘুরে ঢুকে পড়েছি মার্কিন উপকূলে।'

ঠিক এই সময় ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক করে সাংকেতিক নক হলো দরজায়। আওয়াজটা শুনেই কবীর চৌধুরীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'রানা, আমাদের ট্রাক পৌঁছে গেছে। ওই ট্রাক আমাদেরকে একটা জেটিতে নিয়ে যাবে। ওখানে প্রক্টরের বেতনভুক স্টিভিডররা ব্যস্ততার সঙ্গে গত পনেরো ঘণ্টা ধরে একটা জাহাজে সোনা তুলছে। ওই জাহাজেই আমরা উঠব।

'ল্যাজারাস তোমার বাঁধন খুলে দেবে, রানা। আমি আশা করব তুমি শান্তভাবে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ট্রাকে উঠবে। তোমার পিছনে, আশপাশেও, প্রচুর সশস্ত্র লোকজন থাকবে। তোমাকে কোন রকম চালাকি করতে দেখলেই গুলি করবে তারা, অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে না। বুঝতে পারছ তো?'

রানা গম্ভীর। 'যদি বলি ভুল করছ, তাহলে তোমরা হাসবে। কাজেই আমার কিছু বলার নেই।'

কুয়াশার ভেতর চাঁদটাকে ম্লান দেখাচ্ছে। জেটিটা ভাঙাচোরা, একদিকে একটু কাত হয়ে আছে, শেষ মাথায় ভাসছে প্রকাণ্ড ফ্রেইটার–কার্গোর চাপে মরচে ধরা খোল বড় বেশি ডুবে আছে পানির নিচে। নোংরা একটা জাহাজ, পরিত্যক্ত বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যাবে। ট্রাক থেকে নামার সময় মাথার ওপর জাহাজের স্টার্ন ঝুলে থাকতে দেখল রানা, বড় বড় হরফগুলো কালের আঁচড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে–এম.ভি. শাপলা। অনেক দূরে, জেটির শেষ মাথায়, কর্কশ ধাতব শব্দে গোঙাতে গোঙাতে ঘুরে যাচ্ছে বিশাল একটা ক্রেন; ক্রেনের সঙ্গে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড কন্টেইনারটা জাহাজের ডেকে নামল।

'সোনা, রানা,' বলল কবীর চৌধুরী। জেটির পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে, সমান্তরাল রেখার ওপর, পুরানো একটা শেড দেখা যাচ্ছে,

ওটার সামনে খানিক পরপর একটা করে বালব জ্বলছে, ওয়াকওয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আছে হলদেটে আলোয়। 'দেখে তোমার কিছু একটা মনে হচ্ছে না, তাই না? ভাবছ ভাঙাচোরা এরকম একটা জাহাজ সাগর পাড়ি দিয়ে চীনে কিভাবে পৌঁছাবে?'

রানা কথা বলছে না।

বাইরের চেহারা অনেক সময় সত্যি কথা বলে না, রানা,' আবার বলল চৌধুরী। 'ওটার ভেতর নতুন একটা শক্তিশালী এঞ্জিন বসানো হয়েছে, প্রয়োজনে একটা ডেস্ট্রয়ারের চেয়েও বেশি স্পীড তুলতে পারবে। তুমি তো জানোই যে আমার ছেলে খায়রুল কবীর ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর। ইলেকট্রনিক্স গিয়ারের এমন একটা ডিজাইন তৈরি করে দিয়েছে সে, রাডার স্ক্রীনে আমার শাপলা ধরা পড়বে না। একে শাপলাকে কেউ ধাওয়া করবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। একে তো প্রাচীন একটা জাহাজ, তারপর মাস্তুলে ব্রিটিশ পতাকা উড়ছে।

'তো, মিস্টার চৌধুরী,' মাফিয়া ডন প্রস্টর বলল, 'এবার আমাকে বিদায় নেয়ার অনুমতি দিন। আমি রিপোর্ট পেয়েছি, হেরোইনের শেষ কন্টেইনারটা দু'ঘণ্টা আগে শাপলা থেকে তুলে নিয়ে গেছে আমার লোকজন। আপনার কার্গোও আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে যাবে। তারপর যখন খুশি নোঙর তুলতে পারবেন আপনি।' করমর্দন করল ওরা।

তোমার কথার ওপর ভরসা রাখলাম, প্রস্টর।' হাতঘড়িতে চোখ রেখে বলল চৌধুরী। 'ওদেরকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, ঠিক তিনটের সময় রওনা হব আমরা।

'কোন কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না,' প্রস্টর বলল। 'আপনি রওনা না হওয়া পর্যন্ত অফিসেই আছি আমি, যাতে কোন ঝামেলা না হয়।'

'ধন্যবাদ, প্রস্টর। তোমার সহযোগিতা সত্যি ভোলার নয়। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে—ব্যবসাও হবে।'

'তাহলে, গুডবাই,' বলল রানা। ডক্টর ল্যাজারাসের দিকে তাকাল সে। ল্যাজারাস ফ্রিড ডকিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে ইশারা করছে। 'আসি তাহলে, ডক। চীনে যাচ্ছেন তো, চেষ্টা করবেন একটু সাবধানে থাকতে।'

ল্যাজারাস উত্তরে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

'বিদায়, মিস্টার রানা,' বলল ফ্রিড, ভুরু নাচিয়ে জ্যাকেটের পকেট চাপড়াল। ওখানে রানার ওয়ালথার আর খাপসহ ছুরিটা রেখেছে। সুচেনির দুটোর জন্যে ধন্যবাদ।' ফাটল ধরা কাঠের দরজার নড়বড়ে নবটা দু'আঙুলে ধরে ঘোরাল। তারপর পুরনো গোডাউনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'ঠিক হাছে,—দোস্তো,' সাফল্যের উল্লাসে অধীর কবীর চৌধুরী রসিকতা করে বলল, 'সবাই জাহাজে উঠে পড়েন। ভোর হবার আগেই রওনা হবার অনুমতি পেয়েছে এম.ভি. শাপলা।' হেসে উঠল সে। 'কার্গো হিসেবে সাত হাজার টন ইস্পাত নিয়ে।'

ছোট একটা মিছিলের সঙ্গে এগোল রানা। ওর একপাশে রয়েছে ফ্রিড ডকিংকে নিয়ে ডক্টর ল্যাজারাস, আরেক পাশে কবীর চৌধুরী। ওদের সামনে কেউ নেই, পিছনে চারজন বডিগার্ড, তাদের একজন রানার পিঠে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে। জেটি ধরে এগোল ওরা। তারপর গ্যাংপ্লাঙ্কে পা রাখল। মুখ তুলে তাকাতে ফ্লাইং ব্রিজে সীনা ক্যাপটেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। জাহাজে ও জাহাজের আশপাশে ক্রুরা এখনও খুব ব্যস্ত, বেশিরভাগই আরব চীনা।

এঞ্জিন আর ইলেকট্রনিক গিয়ার যতই অত্যাধুনিক হোক, সমুদ্রগামী জাহাজ শাপলায় বন্দীদের থাকার আয়োজন মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ডেকের নিচে পৌঁছে সরু প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা, অতিরিক্ত দু'জন গার্ড নিয়ে বন্দীদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে কবীর চৌধুরী। লোহার একটা সেল দেখা গেল, নিরেট ও কুৎসিত; জানালায় মোটা রড, কাঁচ নেই। লোহার

পাত দিয়ে তৈরি কবাট। অতিরিক্ত গার্ডদের হাতে একটা করে সাবমেশিন গান রয়েছে, দরজার দু'পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল তারা। পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল কবীর চৌধুরী। সেলের দরজা খুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'ভেতরে, রানা।' তারপর ডক্টর ল্যাজারাসকে বলল, 'মিস্টার ডকিংও।'

সেলের মেঝেটাও লোহার পাত দিয়ে মোড়া, তবে খড় দিয়ে ঢাকা। ল্যাজারাস ফ্লয়িড ডকিংকে ছেড়ে দিতে খড়ের ওপর ঢলে পড়লেন তিনি। গার্ড দু'জন দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে, জোড়া মাজল বন্দীদের দিকে তাক করা।

'মিস্টার ডকিং যেমন আছেন তেমনি থাকুন, ল্যাজারাস,' বলল চৌধুরী। 'রানা, কিছু মনে কোরো না–তোমার রেকর্ড যেহেতু ভাল নয়, বাধ্য হয়েই চেইন সহ হাতকড়া পরাতে হচ্ছে।'

কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকাল রানা। চেইন ও কাফ দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত। একজোড়া হাতের জন্যে, আরেক জোড়া পায়ের জন্যে। ওগুলোর ভেতর নিজের হাত ও পা বিনা প্রতিবাদে ঢোকাল রানা। চাবি ঘুরিয়ে ওগুলো লক করল কবীর চৌধুরী।

'সেলের দরজাতেও আমি তালা দেব,' বলল সে। 'তোমার জ্ঞাতার্থে আরও জানাচ্ছি, চাবি এই এক সেটই। অর্থাৎ গার্ডদের বোকা বানিয়েও তোমার কোন লাভ নেই, ওরা তোমার কোন সাহায্যে আসবে না। তবে লক্ষ্যভেদে ওরা কখনও ব্যর্থ হয় না।' পিছু হটে সেল থেকে বেরিয়ে গেল সে। ধাতব গর্জন তুলে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বাইরে থেকে ভেসে এল তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ। তারপর সিধে হলো সে, লোহার রডের ফাঁকে তার মুখ দেখা গেল। 'মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাব, রানা।' হাসি মুখে রানার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গার্ড দু'জনের দুই মাথা এক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, দু'জনেই গরাদের ফাঁক দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের উপস্থিতি বা কৌতূহল রানা গ্রাহ্যই করছে না। একটু পর একঘেয়ে লাগল

তাদের, গরাদের সামনে থেকে সরে গেল।

খুব বেশি হলে ত্রিশ মিনিট পর সেলের বাইরে কারা যেন কথা বলে উঠল। একটু পর গরাদের ফাঁকে আবার কবীর চৌধুরীর মুখ দেখা গেল। এখনও হাসছে, তবে এবারের হাসিটা আরও উজ্জ্বল। তালা চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে ভারী দরজাটা খুলে গেল। দু'জন গার্ড আর কবীর চৌধুরীকে দেখতে পেল রানা, তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফিলিপা।

এগারো

'পাপা!' ছুটে এসে বাবার পাশে হাঁটু গাড়ল ফিলিপা।

এগিয়ে এসে তার বাহু ধরে টান দিল কবীর চৌধুরী। 'বাবার সেবা-যত্ন করার সময় তুমি পাবে, ফিলিপা, তবে আপাতত আবেগে আপ্লুত হওয়া চলবে না তোমার। রানার মত তোমাকেও শিকল পরতে হবে।'

'আপনি একটা পিশাচ! একটা পাষণ্ড!' দাঁড়াবার সময় কেঁদে ফেলল ফিলিপা। 'একবার ভেবে দেখেছেন, কত বড় পাপী আপনি? সোনার লোভে ট্রাক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করালেন, তারপর অ্যাসিড ঢেলে দিলেন মুখে! ল্যাজারাসের মত একটা বুড়ো লম্পটের হাতে আমাকে তুলে দিতেও আপনার বিবেকে বাধল না! এখন আবার বাবাকে বন্দী করে অত্যাচার করছেন...ভেবেছেন ঈশ্বর আপনার এ-সব সহ্য করবে...'

'তুমি অবোধ বালিকা, বাস্তব দুনিয়ার দ্বন্দ্ব ও রহস্য বুঝবে

না।' কবীর চৌধুরী সম্পূর্ণ শান্ত, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'তবে দু একটা কথা বলতেই হচ্ছে–তুমি বোঝো বা না বোঝো, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী মাসুদ রানার কৌতূহল খানিকটা মিটলেও মিটতে পারে। হ্যাঁ, খাঁটি প্রশ্নই তুলেছ তুমি–কোন দোষই তোমাদের ছিল না, তারপরও কেন তোমাদের ওপর আমার অভিশাপ নেমে এলো? আমি কি পাগল? নাকি আমি স্বার্থপর ও লোভী?'

ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে কবীর চৌধুরী, ফিলিপাকে ছেড়ে দিয়ে সেলের ভেতর পায়চারি শুরু করল। 'না, ফিলিপা, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! আমি পাগলও নই, লোভীও নই। লুঠ করা এক ভরি সোনাও আমার নিজের জন্যে খরচ হবে না। সোনা বিক্রি করা পুরো টাকাটাই ব্যয় হবে বিজ্ঞান চর্চায় ও বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে।

'সব ব্যাখ্যা করতে হলে ছোট্ট একটা ভূমিকার দরকার আছে। এ-কথা আমরা সবাই জানি যে এগারোই সেপ্টেম্বর টুইন-টাওয়ার ধ্বংস হবার ফলে গোটা দুনিয়ার চেহারা পাল্টে গেছে। অজেয় ও সুরক্ষিত বলে যে রাষ্ট্র গর্ব করত, অস্ত্র আর টাকার গরমে বাকি দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাত, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতন শুরু হয়েছে। সেই পতনকে বেগবান করাটা এখন খুব জরুরী। মানবসমাজে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হলে, বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হলে, একের পর এক আঘাত হেনে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কোন বিকল্প নেই। ছলে-বলে-কৌশলে দুনিয়ার সব সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে ওরা। গত বিশ বছরে ওরা দুনিয়ার মানুষকে শোষণ করে যা সঞ্চয় করেছে, তা থেকে সামান্য একটু ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। একের পর এক এরকম আরও আঘাত সহ্য করতে হবে দুনিয়ার স্বঘোষিত মোড়লকে। সোনা লুঠ বা টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মতই, কিংবা তারচেয়েও মারাত্মক, আরও একটা ক্ষতি মেনে নিতে হবে ওদের খুব শীঘ্রি।

'শত্রু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। এই

অশুভ শক্তির পতন ঘটাতে হলে আত্মত্যাগ করতেই হবে, একদল অসমসাহসী বীর টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে তার প্রমাণ রেখে গেছে। তারা নিজেদের জীবন দান করে গেল কিসের আশায়? এই আশায় যে একমাত্র সুপার পাওয়ার ধ্বংস হয়ে গেলে দুনিয়ার মানুষ স্বস্তি পাবে, ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হবে, উন্নতি যদি হয় তো সব রাষ্ট্রেরই হবে, এককভাবে কোন জাতি বা কোন রাষ্ট্র মাতব্বরি করতে পারবে না। তারা আমাদেরকে এই শিক্ষাও দিয়ে গেছে যে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়।

'আমাকে ঠিক তাই করতে হয়েছে, ফিলিপা। দুনিয়ার মঙ্গল করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করার দরকার ছিল, আর যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করার জন্যে দরকার ছিল তোমার বাবাকে ব্ল্যাকমেইল করার। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে আমি তোমার চেহারা নষ্ট করে দিলাম, তারপর সেই চেহারা ভাল করে দেয়ার প্রস্তাব দিলাম–এই কৌশল অবলম্বন না করলে তোমার বাবার সহযোগিতা কোনদিনই আমি পেতাম না। ফিলিপা, যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু আমার ভেতর কোনরকম অপরাধবোধ বা পাপবোধ নেই। কারণ আমি তো নিজের লাভের জন্যে এ-কাজ করিনি। আমার জীবনের একটাই সাধনা, মাটির দুনিয়াটাকে স্বর্গে পরিণত করা; যেখানে কেউ কোনদিন মরবে না, বুড়ো হবে না, রোগে শোকে ভুগবে না, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। এই কাজে আমি যদি আমার বয়সকালে সফল না হই–একের পর এক, বারবার জন্ম নেব আমি স্টার...' হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ফিলিপার হাত ধরল কবীর চৌধুরী, একপাশে টেনে এনে মেঝেতে বসাল, হাত ও পায়ে চেইন সহ কাফ পরিয়ে ধীরে-ধীরে সিধে হলো। পিছু হটে সেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারও মুখে কথা নেই, একা শুধু ফিলিপা ফোঁপাচ্ছে। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল সেলের দরজা। তালা লাগাবার শব্দ হলো। ওরা শুনতে পেল কবীর চৌধুরীর পায়ের

আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

এক সময় শান্ত হলো ফিলিপা। 'মিস্টার রানা,' জিজ্ঞেস করল সে, 'এরপর কি ঘটবে?'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ওদেরকে আমরা হার মানতে বাধ্য করব,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'মিস্টার ডকিংকে আমার দরকার হবে, ওঁকে তুমি জাগাও।'

'ঠিক আছে,' বলল ফিলিপা। 'পাপা। পাপা। আমি ফিলিপা।'

ডকিং খড়ের ওপর কাত হয়ে শুলেন।

'পাপা, ওঠো। তোমাকে আমাদের দরকার।'

চোখ মেলে তাকালেন ডকিং। তারপর ধীরে ধীরে বসলেন। 'কে কথা বলল? ফিলিপা? এখানে এত অন্ধকার কেন? আমার চশমাটা কোথায়?'

'ওটা তোমার বাঁ হাতের পাশে, পাপা,' বলল ফিলিপা।

চশমাটা পেয়ে চোখে তুললেন ডকিং, একটা লেন্স না থাকলেও দেখতে পাচ্ছেন। ফিলিপাকে দেখে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওহ্, গড! তুমি যেন ঠিক আমার জন্মদাত্রী মা!' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'শ্-শ্-শ্-শ্, পাপা,' হিসহিস করল ফিলিপা। 'যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর কেঁদে কোন লাভ নেই। এখন চেষ্টা করতে হবে শয়তানগুলোর হাত থেকে আমরা যাতে মুক্ত হতে পারি।'

'কান্না কি আর সাধে আসছে, মা!' ফুঁপিয়ে উঠে বসলেন ডকিং। 'আমি একটা মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি তো আমাকে ভোগ করতেই হবে।'

'পাপা, ওসব কথা ভুলে যাও,' বলল ফিলিপা। 'শোনো, আমাদের সঙ্গে মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক আছেন। চোর-ডাকাত ধরাই তাঁর কাজ। ফ্রান্স থেকে তিনিই আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। এখন তোমার সাহায্য দরকার ওঁর।'

এই প্রথম ডকিং উপলব্ধি করলেন সেলে ফিলিপা ছাড়াও

আরও একজন আছে। মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালেন তিনি।

'ফিলিপা ঠিকই বলছে, মিস্টার ডকিং,' বলল রানা। 'আপনাদের মুক্ত করতে চাই আমি। জাহাজটাও আটকে রাখব। কিন্তু আপনার সাহায্য ছাড়া এ-সব সম্ভব নয়।'

'কিন্তু বন্দী অবস্থায় আমি কি সাহায্য করব আপনাকে?'

'বন্দী হলেও, আপনার হাত-পা মুক্ত,' বলল রানা। 'অনেকভাবেই আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। যেমন, তথ্য দিয়ে। ওদের সম্পর্কে গোপন কিছু হয়তো আপনার কানে এসেছে। হয়তো আপনি ওদের কোন দুর্বলতার কথা জানেন।'

ডকিং কথা বলছেন না।

'পাপা!'

'কি যেন নাম আপনার?' নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন ডকিং। 'মাসুদ রানা? ওহ্, গড! আপনি কি সেই বিখ্যাত রানা এজেন্সির ডিরেক্টর?'

'পাপা, তুমি ওঁকে চেনো?'

'সিকিউরিটির সঙ্গে জড়িত অথচ ওঁর নাম জানে না, এমন কেউ আছে নাকি?' ডকিং রীতিমত উত্তেজিত। 'মিস্টার রানা, আমার পরম সৌভাগ্য...'

'এ-সব পরে,' বাধা দিল রানা। 'আপনি চেষ্টা করে দেখুন স্মরণ করতে পারেন কিনা...'

'গোটা ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেইল আর ডাবল ক্রস, মিস্টার রানা। কবীর চৌধুরীর মত অপরাধী দুনিয়ার বুকে দ্বিতীয়টি জন্মেছে কিনা সন্দেহ। সোনার লোভে আমাকে তো ব্ল্যাকমেইল করেছেই, মাফিয়া ডন প্রক্টরের সঙ্গেও বেঈমানী করছে সে।'

রানার মুখ হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। 'কি রকম?'

'ওরা আমাকে বোকা আর অথর্ব একটা বুড়ো ধরে নিয়েছে। আমার সম্পর্কে একটা তথ্য ওরা মনেই রাখেনি। তা হলো, আমার জন্ম বাংলাদেশে, বাল্যকালটা ওখানেই আমার কেটেছে,

বাংলা আমার মাতৃভাষাও বটে। আজ ওরা আমাকে ফ্ল্যাট থেকে ধরে আনার পর নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল, তখনই আমি ডাবল-ক্রসের ব্যাপারটা জানতে পারি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'ওরা আমাকে কিভাবে ফাঁদে ফেলল তা নিশ্চয়ই ফিলিপার মুখে শুনেছেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে আমার অপরাধ সম্পর্কেও সব জানেন আপনি। আসলে তখন আমার মন-মানসিকতা এমন দাঁড়িয়েছিল, মেয়ের চেহারা ঠিক করার জন্যে পারি না এমন কোন কাজ নেই। সে যাই হোক, কবীর চৌধুরীর নির্দেশ মত কাজ শুরু করার পর দেখলাম ফেডারেল রিজার্ভে যাদেরকে ঢোকানো হচ্ছে তারা সবাই আমেরিকান, এবং মাফিয়া ডন গ্রেগরি প্রক্টরের লোকজন। পরে জানতে পারি, কবীর চৌধুরীর সঙ্গে প্রক্টরের একটা চুক্তি হয়েছে। চুক্তিটা হলো, ফেডারেল রিজার্ভ থেকে সোনা বের করার জন্যে লোকবল দিয়ে সাহায্য করবে প্রক্টর, সোনা গুদামজাত করার ব্যবস্থা করবে, এবং নিজস্ব ডকইয়ার্ডে নিয়ে এসে জাহাজেও তুলে দেবে; বিনিময়ে কবীর চৌধুরী তাকে বিপুল পরিমাণে হেরোইন দেবে।'

'এটুকু আমিও জানি,' বলল রানা। 'আর কি জানেন আপনি?'

'বেঈমানীটা এই লেনদেনের মধ্যেই ঘটছে, মিস্টার রানা।'

'খুলে বলুন।'

'প্রক্টরকে দেয়া কবীর চৌধুরীর হেরোইন,' বললেন ডকিং। 'ওগুলোয় আসলে বিষ মেশানো আছে।'

'মানে?'

'কথাটা সত্যি, মিস্টার রানা,' জবাব দিলেন ডকিং। 'কি বিষ মিশিয়েছে তা বলতে পারব না, তবে জানি যে সমস্ত হেরোইন দু'রকম প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা হয়েছে। সবুজ ব্যাগের হেরোইন

মানুষকে দ্রুত খুন করবে। নীল ব্যাগের হেরোইন কাজ করবে ধীরে-ধীরে। তবে একবার আপনার সিস্টেমের সঙ্গে মিশে গেলে, দুটোই আপনাকে মেরে ফেলবে।'

রানার মনে পড়ে গেল একটু আগে কি বলে গেছে কবীর চৌধুরী: 'সোনা লুঠ বা টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মতই, কিংবা তারচেয়েও মারাত্মক, আরেকটা ক্ষতি মেনে নিতে হবে ওদের...'

হেরোইনে বিষ মেশানো হয়ে থাকলে, তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে শিউরে উঠল রানা। প্রক্টর তার কেনা এই হেরোইন গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে দেবে। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষ হেরোইনে আসক্ত। বিষটা যদি সত্যি জোরালো হয়, কেউ তারা বাঁচবে না। আমেরিকানদের জাতীয় জীবনে এমন একটা বিপর্যয় নেমে আসবে, টুইন টাওয়ার ধ্বংসকে মনে হবে তাৎপর্যহীন। কবীর চৌধুরীর এই অস্ত্র অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও মারাত্মক।

কবীর চৌধুরী যদি পালিয়ে যেতে পারে, আমেরিকানরা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম পাইকারী হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করবে গ্রেগরি প্রক্টরকে।

মনে মনে একটা হিসাব কষছে রানা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার একটা উপায় পাওয়া গেছে। 'ঠিক আছে, এবার শুনুন কি করতে হবে আপনাকে,' ডকিংকে বলল ও। 'ফিলিপা বলেছে, আপনি একজন তালা বিশেষজ্ঞ। আপনার ছোঁয়ায় জাদু আছে, যে-কোন তালা খুলতে পারেন।'

'সব মেয়েই বাপের কথা একটু বাড়িয়ে বলে,' বললেন ডকিং। 'তবে তালার কাজ জানি আমি।'

'তাতেই হবে,' বলল রানা। 'এখন চেষ্টা করে দেখুন আমাকে শেকল মুক্ত করা যায় কিনা। তারপর সেলের দরজাটাও খুলতে হবে।'

'আপনি আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন, মিস্টার রানা।' মাথা

চুলকাচ্ছেন ডকিং। 'টুলস ছাড়া তালা খোলা কি করে সম্ভব?'

'টুলস বলা যায় কিনা জানি না, তবে দু'একটা জিনিস আছে...'

'কোথায়?'

'আমার টার্টলনেকের পিছনে,' বলল রানা। 'একজোড়া রেজার ব্লেড পাবেন আপনি, সিঙ্গেল-এজ্‌ড্‌।'

প্রৌঢ় ডকিং টলতে টলতে সিধে হলেন, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন রানার দিকে। রানার কলারের পিছন থেকে ব্লেড দুটো বের করলেন তিনি। হাসি ফুটল মুখে। 'উন্নতমানের ইস্পাত। হ্যাঁ, মিস্টার রানা, এগুলো বোধহয় কাজে লাগাতে পারব।' তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। 'এখানে যে তালা দেখছি, মান্ধাতা আমলের। দরজার তালার মেকানিজম সম্ভবত আরও সহজ। দেখা যাক।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ি, বিশ মিনিট।'

'তাড়াতাড়ি করুন,' বলল রানা। 'কেউ যদি এসে পড়ে, ব্লেডগুলো খড়ের তলায় লুকিয়ে রাখবেন।'

খড় ঢাকা মেঝেতে এরইমধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন ডকিং, তাঁর হাত দুটো রয়েছে গরাদ হয়ে ভেতরে ঢোকা চৌকো আলোয়। ভদ্রলোক কি করছেন রানা তা দেখতে পাচ্ছে না, তবে লোহার পাত দিয়ে মোড়া মেঝের সঙ্গে ইস্পাত ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

কল্পনার চোখে বিশাল ক্রেনটা দেখতে পাচ্ছে রানা, প্রক্টরের স্টিভিডররা কন্টেইনারে ভরে সোনার বার তুলছে জাহাজে। ও জানে, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়। জাহাজে সোনা ভরার কাজ শেষ হলে কবীর চৌধুরী এক মুহূর্তও দেরি করবে না, নোঙর তুলে রওনা হয়ে যাবে।

'দেখি এতে কাজ হয় কিনা,' বলে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন

ডকিং। তাঁর হাতে ক্ষুরের একটা ফলা দেখতে পাচ্ছে রানা–যেটুকু অবশিষ্ট আছে। দেখে রানার মনে হলো, ফলাটা প্রথমে লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগ করা হয়েছে, তারপর ঘষে একটা টুকরোর দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে। রানার পাশে এসে বসলেন তিনি, ওর ডান হাতে পরানো শেকলের তালাটা ধরলেন। চোখা করা ফলা তালায় ঢোকাবার পর মাথা নিচু করে একটা কান ওটার কাছাকাছি নামালেন। সদ্য তৈরি চাবিটা দু'আঙুলে ধরে ধীরে ধীরে মোচড়ালেন। 'আরও একটু ঘষতে হবে,' বলে আলোর কাছে ফিরে গেলেন আবার। আবার ধাতব শব্দ পেল রানা।

'এবার কাজ হবে,' ফিরে এসে বললেন ডকিং। তালায় চাবি ঢুকিয়ে জোরেই ঘোরালেন এবার। নিস্তব্ধ সেলে বোমা ফাটার মত আওয়াজ করল–ক্লিক! রানার হাতে পরানো কাফ খুলে গেল।

উত্তেজনায় চকচক করছে ডকিং-এর মুখ। 'বাকিগুলো পানির মত সহজ,' ফিসফিস করলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রানার বাঁ হাত ও পায়ের তালা খুলে দিলেন।

তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে রানা বলল, 'দরজায় কাজ শুরুর আগে ফিলিপাকে মুক্ত করুন।'

ফিলিপাকে মুক্ত করতে এক মিনিট লাগল।

'এবার বলুন, সেলের দরজা কিভাবে খুলবেন,' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

ডান হাতটা রানার দিকে বাড়ালেন ডকিং। তালুতে দ্বিতীয় ক্ষুরটা রয়েছে, অক্ষত। দু'আঙুলে ক্ষুরের ভোঁতা দিকটা ধরলেন তিনি, অপর হাতে দু'আঙুলের মাঝখানে ঢুকিয়ে ফলাটা আগুপিছু করলেন কয়েকবার। 'এই পদ্ধতিটাকে "Loideng" বলে। সাধারণত একটা সেলুলয়েড কার্ড দিয়ে কাজটা করতে হয়। তালার জিভকে নড়াতে যে রিজিডিটি আর ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার, ওই কার্ডের তা আছে। তবে এই পাত দিয়েও কাজটা করা সম্ভব।'

'খুব বেশি শব্দ হবে?'

'বলতে পারছি না,' জবাব দিলেন ডকিং। 'জিভটা পিছন দিকে ছুটলে কি ঘটবে বলা মুশকিল। যাই ঘটুক, ঝুঁকিটা নিতে হবে।'

'হ্যাঁ, আর কোন উপায় নেই।' সায় দিল রানা। 'ফিলিপাকে দরজার আড়ালে সরিয়ে দিচ্ছি আমি, সঙ্গে সঙ্গে গুলি হলে ওকে যেন না লাগে। আপনিও কাজ সেরে আড়াল নেবেন। আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেও আপনারা নড়বেন না, যতক্ষণ আমি না ডাকি।'

দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে কাজ শুরু করলেন ডকিং।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রানা।

ডকিং-এর কব্জি একবার, দু'বার, তিনবার নড়ল—দরজা ও ফ্রেমের মাঝখানে ফলাটা ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন। রানার দিকে তাকালেন তিনি, মাথা ঝাঁকালেন। 'কাজ হবে,' ফিসফিস করলেন তিনি।

অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। দুটো সাবমেশিন গানই হাতে পেতে হবে ওকে।

বারো

গেট খোলার শব্দ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, দু'পাশে দাঁড়ানো গার্ড দু'জন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল রানাকে। বাঁ দিকের গার্ড কাঁধ থেকে অস্ত্র নামাবার কোন সুযোগই পেল না,

ঝেড়ে তার পেটে একটা লাথি মারল রানা, মেরেই লাফ দিল পিছন দিকে।

দ্বিতীয় গার্ডের হাতেই ছিল সাবমেশিন গান, ওটা এবং রানাকে নিয়ে দড়াম করে প্যাসেজের মেঝেতে পড়ে গেল সে। সিধে হবার আগে তার মাথাটা ধরে শক্ত দেয়ালে ঠুকে দিল রানা, তারপর ছিটকে পড়া প্রথম গার্ডের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, নাগালের মধ্যে পেয়ে তার মাথাটাও ঠুকে দিল মেঝের সঙ্গে। বিনা প্রতিবাদে জ্ঞান হারিয়েছে দু'জনেই।

ওদেরকে টেনে সেলের ভেতর ঢোকাল রানা, বাকি দু'জনকে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল প্যাসেজে। একটা অস্ত্র নিজের কাছে রেখেছে ও, দ্বিতীয়টা ধরিয়ে দিয়েছে ডকিঙের হাতে। 'বাধ্য না হলে এটা ব্যবহার করবেন না,' বলল রানা। 'এবার আমার প্ল্যানটা শুনুন। আমরা জাহাজের ওপর দিকে উঠব না। এই ডেক ধরেই পিছন দিকে যাব। কি খুঁজছি আমি জানি, সেটা দেখতে পাব জাহাজের একপাশে, জেটি থেকে খানিকটা দূরে।'

'হাতে যখন অস্ত্র আছে, কবীর চৌধুরীকে জিম্মি করলে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করলেন ডকিং। 'তাকে জিম্মি করতে পারলে তার লোকজন সারেন্ডার করতে বাধ্য হত...'

'সংখ্যায় ওরা কত ভেবে দেখেছেন? তাছাড়া, কবীর চৌধুরীকে পাচ্ছি কোথায় যে জিম্মি করব? আমি যেভাবে বলছি সেভাবে চিন্তা করুন। যাবার পথে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গুলি করবেন না, করতে হলে আমি করব। আরেকটা কথা। আমার যদি কিছু হয়, চেষ্টা করবেন লুকিয়ে থাকতে—যদি পালানো সম্ভব না হয়। আমি না থাকলেও রানা এজেন্সির লোকজন পৌঁছাবে। ওদের সঙ্গে এফবিআই-ও থাকবে...'

'কিন্তু আমি শুনেছি এফবিআইকে প্রক্টর কিনে রেখেছে, তার কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তারা হানা দেবে না!'

'এফবিআইকে কেনা সম্ভব না,' বলল রানা। 'প্রক্টর

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে ঘুষ দেয়, ব্ল্যাকমেইলও করে, কিন্তু রানা এজেন্সি হোয়াইট হাউসের মাধ্যমে সরাসরি ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এখন আসুন...'

জাহাজে ওঠার সময় ওটা লক্ষ করেছিল রানা–এম.ভি. শাপলার পোর্ট বীম-এ খুদে একটা দরজা। আলো-ছায়ার ভেতর প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা, কয়েকটা বাঁক ঘোরার পর নিশ্চিত হলো জাহাজের পিছন দিকেই যাচ্ছে। কেউ কোন শব্দ করছে না। জাহাজের এদিকটা পুরোপুরি নির্জন।

খুদে দরজাটা যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

এক গজ লম্বা হাতলটা ঘোরাবার জন্যে শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হলো রানাকে। ভারী কবাট খোলার পর উঁকি দিতে নিচে দেখা গেল ইস্ট রিভার-এর আলোড়িত ঘোলা পানি। 'তুমি আগে, ফিলিপা,' বলল রানা। 'চৌকাঠ ধরে ঝুলে পড়ো, তারপর হাত ছেড়ে দাও। সাঁতরে জেটির দিকে যাব আমরা। স্টারবোর্ড বীম-এর কাছাকাছি একটা মই আছে, জেটিতে উঠে গেছে। মিস্টার ডকিং, সাঁতরাতে পারবেন তো?'

'পারতেই হবে।'

তিনজন প্রায় এক সঙ্গেই মইটার কাছে পৌঁছাল ওরা। রানা জানাল, মই বেয়ে জেটিতে ওঠার পর ফিলিপাকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন ডকিং। ও যাবে জন প্রক্টরের কাছে। ডকিঙের সাবমেশিন গান ভিজে গেছে, নদীতে ফেলে দেবেন ওটা। ওরটা ওর কাছেই থাকবে।

'না, এ আমি মানছি না!' প্রতিবাদ করল ফিলিপা। 'আপনাকে একা আমি যেতে দেব না।'

মেয়েকে সমর্থন করলেন ডকিং। 'আমরা সঙ্গে থাকলে আপনার সাহায্যে লাগব, মিস্টার রানা।'

'সাহায্য আমি প্রক্টরের কাছ থেকে নেব,' বলল রানা। 'এই পর্যায়ে এসে এমন কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় যাতে আপনারা

আহত হন।'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকছি,' জেদের সুরে বলল ফিলিপা। 'দেখিয়ে দিলে এই অস্ত্র আমিও চালাতে পারব, যেহেতু পিস্তল চালাতে জানি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি যদি সত্যি কাজে লাগতে চাও, তার উপায় আমি বলে দিচ্ছি। তবে আমার সঙ্গে থেকে তা সম্ভব নয়।'

'কি কাজ আমাকে বলুন,' জানতে চাইলেন ডকিং।

'ফিলিপা, রানা এজেন্সির এজেন্টরা তোমাকে কিছু দেয়নি?' প্রশ্ন করল রানা।

'কই, কি দিয়েছে...ও, হ্যাঁ,—একটা ফোন নম্বর।'

ডকিংকে রানা বলল, 'আমাদেরকে বা ফিলিপাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে তা হয়তো এখনও জানতে পারেনি আমার এজেন্সির লোকজন। ফোন করে ওদেরকে লোকেশনটা জানাবেন, তারপর বলবেন যে-কোনভাবে ওরা যেন এম.ভি. শাপলাকে থামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে।'

'ঠিক আছে।'

'দিন,' বলে ডকিঙের হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে পানিতে ছেড়ে দিল রানা, তারপর মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। জেটির কিনারায় পৌঁছে শুধু মাথা তুলে চারপাশটা দেখে নিল ও। পরিস্থিতি অনুকূলই মনে হলো। হৈ-চৈ আর ব্যস্ততা সবই জাহাজের বো-র দিকে। সবার চোখ এখন বিশাল ক্রেনটার দিকেই থাকবে। ওটা এখনও সচল, ঝুলতে ঝুলতে জেটির দিকে ফিরে আসছে। রানা আশা করল, অন্তত আরও একটা সোনা ভর্তি কন্টেইনার নেয়ার জন্যে ফিরছে ওটা। নিচে তাকাল রানা। ডকিং হাঁপাচ্ছেন। তাঁর নিচেই রয়েছে ফিলিপা। 'আমাকে পাশ কাটিয়ে উঠে যান আপনারা,' বলল ও। 'মাথা নিচু করে রাখবেন, ছায়া থেকে বেরুবেন না।' রানাকে পাশ কাটিয়ে জেটিতে উঠে পড়ল ওরা। 'যান! আমি কাভার দিচ্ছি।'

মেয়েকে নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন ডকিং।

রানা এখন একা, কবীর চৌধুরী আর মাফিয়ার মাঝখানে। এদিকে সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্রল করে এগোল রানা। জেটি থেকে ওয়াকওয়েটা চলে গেছে ফাটলবহুল একটা দরজার দিকে। জেটির প্রায় পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে সমান্তরাল রেখার ওপর লম্বা একটা পুরানো শেড দাঁড়িয়ে আছে, ওটার গায়েই দরজাটা। ওই দরজা দিয়েই ডন প্রক্টরকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছিল রানা।

চৌকাঠের পাশে সিধে হলো রানা। নড়বড়ে নবটা ধরে ঘোরাল। তালা দেয়া নেই। চারদিকটা ভাল করে আরেকবার দেখে নিয়ে কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

অন্ধকার হলেও অনেক দূরে আলোর ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেল। হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে সেদিকে এগোল রানা। তার দিয়ে বাঁধা বড় বড় বেইল ঝুলে আছে দু'পাশে, পথটাকে সরু করে রেখেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ও। আলোটা উজ্জ্বল হলো। ওটা একটা অফিস কামরার ভেতর জ্বলছে। চারদিকে আলোকিত বেশ কয়েকটা জানালা দেখতে পেল ও, ভেতরে বসে নদী ও ওয়্যারহাউস দুটোর ওপরই চোখ রাখা যায়।

ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে এম.ভি. শাপলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গ্রেগরি প্রক্টর। একজোড়া টেলিফোন আর জাহাজ সংক্রান্ত কয়েকটা পত্রিকা ছাড়া ডেস্কটা খালি।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে সাবমেশিন গানের মাজলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা। 'ফ্রিজ, প্রক্টর।'

মাফিয়া ডনের চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকল, একদৃষ্টে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'চেয়ার ছাড়ো, প্রক্টর,' বলল রানা। 'জানালার পর্দাটা টেনে দাও, জাহাজ থেকে তোমাকে যাতে দেখা না যায়। ফিরে এসে যখন আবার বসবে, হাতদুটো ডেস্কে রাখবে। তোমার জন্যে ইন্টারেস্টিং একটা খবর আছে আমার কাছে।'

'কিন্তু আমি তো তোমার কোন কথা শুনতে চাই না,' জবাব দিল প্রক্টর।

'না শুনলে ঠকে ভূত হবে।' হাসল রানা। 'ভূতটা হবেও ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে।'

জবাবে চেয়ার ছেড়ে জানালার দিকে এগোল প্রক্টর। তার ওপর চোখ রেখে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। প্রক্টর ফিরে এসে চেয়ারে বসার পর দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। 'যা বলার তাড়াতাড়ি।'

'বন্ধু কবীর চৌধুরী তোমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে, প্রক্টর।'

'হো-হো! এরপর বলবে, এফবিআই চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে আমাকে।'

'সেটা বিশ্বাস করলেও নিজের উপকার করবে তুমি,' বলল রানা। 'আমি জেনেই বলছি, প্রক্টর। এখন তুমি যদি ডবল ক্রসিং করার পরও কবীর চৌধুরীকে সোনা নিয়ে চলে যেতে দাও, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, রানা, হেঁয়ালি বাদ দাও। ডাবল-ক্রসটা কি?'

'হেরোইন।'

'ওগুলো নির্ভেজাল,' বলল প্রক্টর। 'আমি বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে টেস্ট করিয়েছি।'

'টেস্ট করিয়েছ শুধু নমুনাগুলো, তাই না, নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাগ নয়?'

'কয়েকশো টন হেরোইন, সব কি আর টেস্ট করা সম্ভব? নমুনা হিসেবে প্রথমে যে দুই টন পেয়েছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে টেস্ট করানো হয়েছে।'

'ওই দুই টনই নির্ভেজাল,' বলল রানা। 'বাকি হেরোইনে বিষ মেশানো আছে।'

'চালাকি বাদ দাও, রানা,' বলল প্রক্টর। 'আমাকে ডামি ভাবলে ভুল করবে। এই চুক্তি বাতিল করার একটাই উপায় আছে তোমার; কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমাকে খেপিয়ে তোলা। সেই চেষ্টাই করছ তুমি। কিন্তু আমি তোমার কথায় কান দিচ্ছি না।'

'হেরোইনে দু'ধরনের বিষ মেশানো আছে,' বলল রানা। 'সবুজ ব্যাগের বিষ মারাত্মক।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল প্রক্টর। 'স্বীকার করছি, তুমি আমাকে আগ্রহী করে তুলছো। সবুজ ব্যাগের কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'যেভাবে নীল ব্যাগের কথা জেনেছি। জাহাজে তোমার লোক যারা উঠেছে তারা বাংলা জানত না, জানলে তারাও তথ্যটা পেত। ফ্লয়িড ডকিং বাংলা জানেন, বাংলাদেশে জন্মেছেন।'

'তুমি কিন্তু মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ, রানা,' বলল প্রক্টর। 'আমি ইচ্ছা করলে এখুনি আরেকবার টেস্ট করাতে পারি। যদি প্রমাণ হয় তুমি আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছ, হেরোইনে বিষ নেই, তার পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না।'

'জানি,' বলল রানা। 'শেষ যে চালানটা পেয়েছ তা থেকে খানিকটা হেরোইন আনাও–পুরো একটা সবুজ ব্যাগও আনাতে পারো। কিন্তু টেস্ট তুমি কার ওপর করবে? সে তো নির্ঘাত মারা যাবে।'

জবাব না দিয়ে একটা টেলিফোন তুলল প্রক্টর। 'বনি,' বলল সে। 'একটা সবুজ ব্যাগ নিয়ে এসো। হ্যাঁ, এখুনি।' খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়াই যাক। পিছু হটো। ডেস্কের সামনে ট্র্যাপ ডোর আছে, ওটা খুলে ঘরে ঢুকবে বনি। হাতের অস্ত্র সামলে রাখো, আমার নির্দেশ না পেলে বনি কিছু করবে না।'

রানার নিচের দিকে যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন উঠল, সেই সঙ্গে

মেঝের একটা অংশ সরে গেল একপাশে; ভেতর থেকে উঁকি দিল বনি–সুদর্শন এক তরুণ।

গর্ত থেকে উঠে এল বনি, মেঝেটা আবার জোড়া লেগে গেল। হাতের সবুজ প্লাস্টিক ব্যাগটা ডেস্কে নামিয়ে রাখল সে।

'হ্যাঁ, আমাদের একটা গিনিপিগ দরকার,' বলল প্রক্টর। 'সে কে, আমি জানি।' এবার দ্বিতীয় টেলিফোনটা তুলল। 'মিস্টার চৌধুরী জলদি।' দীর্ঘ বিশ কি পঁচিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো তাকে। আবার যখন কথা বলল, কণ্ঠস্বর ভরে উঠল উদ্বেগে। 'মিস্টার চৌধুরী? ডন প্রক্টর। শুনুন, আমার এক ছেলে হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে। ডাক্তারী ব্যাগটা দিয়ে ডক্টর ল্যাজারাসকে এখুনি একবার পাঠান, প্লীজ।' কবীর চৌধুরীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল প্রক্টর।

জানালার পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে জাহাজের দিকে তাকাল রানা। দু'মিনিটও পার হলো না, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে দেখা গেল ডক্টর ল্যাজারাসকে, লম্বা পা ফেলে জেটিতে নেমে আসছে। 'শয়তান ডাক্তার আসছে।'

'ওকে নিয়ে এসো, বনি,' নির্দেশ দিল প্রক্টর। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল বনি।

একটু পর বাইরে থেকে দু'জোড়া পায়ের শব্দ ভেসে এল। নিজের পজিশন বদল করে এমন এক জায়গায় দাঁড়াল রানা, প্রয়োজন হলে যেখান থেকে ডন প্রক্টর ও বনিকে এক ঝাঁক বুলেট উপহার দিতে পারবে।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলছে। কামরায় প্রথমে ঢুকল ডক্টর ল্যাজারাস, পিছু নিয়ে বনি।

রানাকে দেখে অবিশ্বাসে চোখ পিটপিট করল ল্যাজারাস। রানা লক্ষ করল, বাকি অর্ধেক গোঁফ এখনও সে কামায়নি। 'আপনি!'

'আরে, পুরানো শত্রুকে তাহলে চিনতে পেরেছ!' হাতের অস্ত্রটা তুলল রানা, চিবুকের নিচে মাজল চেপে ধরল।

'এর মানে কি?' জানতে চাইল সে।

'চোপ ব্যাটা!' মাজল দিয়ে ল্যাজারাসের কণ্ঠনালীতে গুঁতো মারল রানা।

'ভাই ডাক্তার,' প্রক্টর হাসি মুখে বলল, 'আমি আর রানা একটা বাজি ধরেছি। এই ব্যাগটার হেরোইন নিয়ে।'

ল্যাজারাসের গলা থেকে মাজল সরিয়ে নিল রানা।

'হেরোইন নিয়ে আবার বাজি কিসের,' বলল ল্যাজারাস। 'ওটা তো শুধু হেরোইনই।'

'আমিও তো সে কথাই বলছি, ডাক্তার,' বলল প্রক্টর। 'কিন্তু রানা বলছে অন্য কথা। ও বলছে, এই হেরোইনে বিষ মেশানো আছে।'

'ওর কথায় আপনি কান দেবেন কেন!' ল্যাজারাস খেপে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখছে। 'ও কি জানে!'

'রানা বলছে, ও অনেক কিছু জানে, ডক্টর ল্যাজা।'

'আর আপনি ওর কথা বিশ্বাস করছেন?' ল্যাজারাস একাধারে বিস্মিত ও আহত। 'ও কে, ওর কি উদ্দেশ্য, এ-সব আপনি বোঝেন না?'

'এখন পর্যন্ত আমার আগ্রহ ধরে রেখেছে ও।'

'কবীর চৌধুরী একজন সম্মানী মানুষ,' বলল ল্যাজারাস। 'তিনি আপনার সঙ্গে বেঈমানী করতে পারেন না।'

'আমিও তো সেটাই রানাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম,' বলল ডন প্রক্টর। 'কিন্তু ওর সেই এক কথা–নিশ্চিত হয়ে নিলে ক্ষতি তো নেই। সেজন্যেই এখানে আপনাকে ডাকা হয়েছে, ডক্টর ল্যাজা। কারণ নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গ্রেগরি, হেরোইন খাঁটি কি ভেজাল তা টেস্ট করাবার জন্যে সবচেয়ে ভাল লোক কে হতে পারে?" আমি নিজেই উত্তর দিলাম, "কেন,

আশপাশে ডক্টর ল্যাজা থাকতে আর কাউকে খোঁজার দরকার আছে নাকি? ডক্টর ল্যাজা একাধারে একজন সাইকিয়্যাট্রিস্ট ও সার্জেন, তার ওপর হেরোইনেও আসক্ত।" কাজেই, ডাক্তার, আমি আপনাকে বিনা পয়সায় একটা স্যাম্পল দিচ্ছি।'

'ও আমি চাই না,' ল্যাজারাস বলল।

'চান না?' প্রক্টর অবাক। 'চান না? শুনলে, বনি? উনি বলছেন বিনা পয়সায় দিলেও হেরোইন নেবেন না।'

'সত্যি দারুণ,' বলল বনি। 'কোন অ্যাডিক্টকে বিনা পয়সায় দিলেও নেয় না, জীবনে এমন কথা শুনিনি।'

'আসলে কিন্তু নিতে চান, বুঝলে বনি,' সবজান্তার হাসি হেসে বলল প্রক্টর। 'ভদ্রতায় বাধছে, লজ্জার খাতিরে নেব বলতে পারছেন না। কি, তাই না, ডক্টর ল্যাজা?'

ল্যাজারাসের মুখে মুক্তোর দানার মত ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে। 'নেব না!' চিৎকার করল ল্যাজারাস। 'আমি হেরোইন নেব না!'

'টট্! টট্!' জিভ ও টাকরা সহযোগে মুখের ভেতর আওয়াজ করল মাফিয়া চীফ। 'একেই বলে ভদ্রতাকে টেনে চরমে নিয়ে যাওয়া।' জ্যাকেটের পকেট থেকে খাপে ভরা ছুরিটা বের করল সে, খাপটা ডেস্কে ফেলে ছুরি দিয়ে সবুজ ব্যাগটা কাটল। ডেস্কের ওপর সাদা পাউডার ঝরে পড়ল খানিকটা।

'এবার, ডক্টর ল্যাজা, এখানে আমরা আপনার সম্মানে ছোট্ট অথচ আন্তরিকতায় উষ্ণ একটা বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করব। এখানে মোমবাতি নেই, তবে আমার কাছে দেশলাই আছে। বনি, তুমি যদি ডাক্তারের ব্যাগে হাত ঢোকাও, আমি জানি, ওখানে একটা সিরিঞ্জ আর কিছু হাইপডারমিক সুই পাবে। দু'একটা রাবার হোমিং-ও পাবে বলে আশা রাখি।'

হাত বাড়িয়ে ল্যাজারাসের কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিল বনি। সেটা খুলে ভেতরটা হাতড়াচ্ছে প্রক্টর।

'মিস্টার রানা, আপনার পায়ে পড়ি, ওঁকে আপনি থামান!' মিনতি করল ল্যাজারাস।

'এতে অসুবিধেটা কি, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি তো কোন বিপদ বা ক্ষতি দেখছি না, যদি তুমি সত্যি কথা বলে থাকো।'

'প্লীজ, স্যার, প্লীজ!'

ল্যাজারাস রানার দিকে তাকিয়ে নেই। তাকাতে হয়তো চাইছে, কিন্তু পারছে না। কারণ তার দৃষ্টি ডেস্কের ওপর আঠার মত আটকে গেছে।

ডন প্রক্টর ও বনি ডেস্কে খুব ব্যস্ত।

ল্যাজারাস থামতেও পারছে না। যেন কেউ একটা সুইচ অন করায় অনর্গল কথা বলতে হচ্ছে তাকে। 'সোনা নিন, মিস্টার রানা। যত খুশি তত নিন। আমার সবটুকু শেয়ার, স্যার। নিতে ইচ্ছে না হলেও নিন। সারাজীবন আর কাজ করতে হবে না, পায়ের ওপর পা তুলে বাকি দিনগুলো ফুর্তি করবেন। বিনিময়ে আমাকে শুধু এখান থেকে বের করে নিয়ে যান। আপনি তা অনায়াসে পারেন। প্লীজ...'

ডেস্কের পিছনে সিধে হলো মাফিয়া চীফ। তার পাশে দাঁড়ানো বনির হাতে তরল হেরোইন ভর্তি সিরিঞ্জ।

'তোমার জন্যে আমি দুঃখিত নই, ল্যাজারাস,' বলল রানা। 'তবে যদি চাও দুঃখিত হই, তোমাকে বলতে হবে বাকি সাত হাজার টন সোনা কোথায় রেখেছে কবীর চৌধুরী।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে ল্যাজারাস ত্রাহি স্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

'কেউ আপনার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না, ডাক্তার,' বলল প্রক্টর। 'বাইরে বড় বেশি শব্দ। পুরনো তো, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ক্রেনটার। তো বলে ফেলুন না, বাকি সোনা কোথায় আছে। বললে হয়তো আপনাকে আমরা রেহাই দিতেও

পারি। আর না বললেও ক্ষতি নেই, আমি জানি। আমিই জানাতে পারব রানাকে।'

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে আকারে ছোট হয়ে গেল ল্যাজারাস। মুখটা দরদর করে ঘামছে। 'এ কাজ করবেন না!' প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাতজোড় করল। 'দয়া করুন! ওহ্, প্লীজ, এ কাজ করবেন না! সত্যি বলছি, সোনা কোথায় রাখা হয়েছে আমি জানি না...'

ঠাস করে তার গালে চড় মারল প্রক্টর। 'শাট আপ্! আপনি তো শালা দেখছি পুরুষ মানুষের ইজ্জত মেরে দিচ্ছেন! এই ভয় পাক, কোন মেয়ে মানুষও এমন করে না।' খপ করে ল্যাজারাসের ডান বাহুটা ধরল সে, শার্ট আর জ্যাকেটের আস্তিন কনুইয়ের ওপর তুলে দিল। পুট করে ছিঁড়ে ছিটকে পড়ল একটা বোতাম, মেঝেতে গড়াচ্ছে।

হাতে সিরিঞ্জ নিয়ে ল্যাজারাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বনি।

ল্যাজারাস ফোঁপাতে শুরু করল। প্রক্টর আরও একটা চড় কষল তাকে। 'শান্ত হন, ডাক্তার,' বলল সে। 'উজ্জ্বল দিকটা সম্পর্কে ভাবুন। আগামী দু'মিনিটের মধ্যে কঠিন বাস্তব দুনিয়া পিছনে ফেলে রঙিন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করবেন—কিংবা মারা যাবেন। যাই ঘটুক, আপনার সমস্ত জাগতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ল্যাজারাসের চোখ।

'তার মানে আপনি জানেন এতে বিষ আছে! হ্যাঁ, বনি, ঠিক আছে,' প্রক্টর বলল। পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে ল্যাজারাসকে দাঁড় করাল সে, নগ্ন ডান হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।

শরীরটা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল ল্যাজারাস। ঝেড়ে এমন একটা লাথি মারল বনিকে, পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে।

প্রক্টরের লাল মুখ বেগুনি হয়ে গেল। 'ছি, একজন ডাক্তার কি এভাবে লাথি মারে!' বিড়বিড় করল সে।

এখনও ফোঁপাচ্ছে ল্যাজারাস। মাংসল ও লোমশ একটা হাত দিয়ে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরল প্রক্টর, অপর হাত দিয়ে নগ্ন বাহু আটকে রাখল। 'ঠিক আছে, বনি,' বলল সে। 'আরেক বার চেষ্টা করে দেখো।'

এবার এক পাশ থেকে এগিয়ে এল বনি, ঠিক একজন বুল-ফাইটারের মত, হাতে খুদে তরোয়াল। ল্যাজারাসের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে, সুইটা নগ্ন বাহুতে তাক করল। বাহুর ওখানটায় বিন্দু বিন্দু অসংখ্য কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। চামড়া ভেদ করে শিরায় ঢুকে গেল সুই, প্লাঞ্জার ঠেলে তরল হেরোইন প্রবেশ করাল বনি। ল্যাজারাসকে ছেড়ে দিল প্রক্টর। বনিকে নিয়ে পিছিয়ে এল সে।

টান টান হলো ল্যাজারাস। শার্ট ও জ্যাকেটের আস্তিন নামাল। 'আমি এখন চলে যাব,' বুজে আসা বেসুরো গলায় বলল সে। 'আপনাদের কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে।'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরছে প্রক্টর। রানা জানে, ওই পকেটেই ওর ওয়ালথারটা রেখেছে সে।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল ল্যাজারাস। 'ডাক্তারী ব্যাগটা আমার দরকার হবে,' বলল সে। ডেস্কের দিকে এগোল—এক পা, দু'পা।

রানার হাতের সাবমেশিন গান প্রক্টরের বুকে তাক করা।

চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল ল্যাজারাস। 'এভাবে কেউ নিজের কপাল পোড়ায়?' বিদ্রূপ করল সে। 'আমার শেয়ারটা সাধলাম, নিলেন না। এখন ভুতি চুষুন। দেখুন শেষ হাসিটা কে হাসছে—হা-হা-হা...'

তারপর ল্যাজারাসের মুখ থেকে আর শব্দ বেরুল না, বেরুল শুধু রক্ত। গল-গল করে বেরিয়ে এসে তার জ্যাকেট আর শার্ট লাল করে তুলল। স্রোতটার দিকে অদ্ভুত এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ল্যাজারাস, রক্তটা যেন অন্য কারও।

বিরাট একটা কোঁত পাড়ল ল্যাজারাস, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক

ঝাঁকি খেলো। পিছন দিকে ছিটকে গেল শরীরটা, সশব্দে মেঝেতে পড়ল। হাঁ করা মুখ থেকে এখনও থেমে থেমে রক্ত বেরুচ্ছে। ল্যাজারাস মোচড় খেতে শুরু করল। শরীরে খিঁচুনি উঠছে। একটু পরই হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে।

'জেসাস।' বিড়বিড় করল বনি।

তেরো

'ধন্যবাদ, রানা,' মাফিয়া চীফ গ্রেগরি প্রক্টর মুক্ত-ঝরা হাসি দিয়ে শুরু করল। 'তোমার কথাই সত্যি হলো।' দপ করে নিভে গেল হাসিটা। 'এসো, এবার একটা চুক্তিতে আসা যাক।'

'আমরা আপাতত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছি–তুমি আর আমি,' বলল রানা। 'এখন আমরা এই উদ্দেশ্যে জোট বাঁধব, কবীর চৌধুরী যাতে সোনা নিয়ে পালাতে না পারে। এই কাজে সফল হবার পর যে-যার ভূমিকায় আবার ফিরে যাব আমরা–তখন চাচা আপন জান বাঁচা!'

'ফেয়ার এনাফ!' মেনে নিল প্রক্টর। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফোন তুলে নির্দেশ দিল, 'ক্রেন থামাও।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ক্রেন এঞ্জিনের কর্কশ যান্ত্রিক গুঞ্জন থেমে যাচ্ছে। জাহাজের অনেক ওপরে প্রকাণ্ড একটা কন্টেইনার ঝুলছে, সরাসরি নিচে একটা খোলা হ্যাচ।

বনির দিকে ফিরল প্রক্টর। 'নিচতলায় যাও,' নির্দেশ দিল সে। 'ছোকরাদের ডাকো। বলবে যত বেশি সম্ভব ফায়ার পাওয়ার নিয়ে

আসতে হবে। সঙ্গে প্রচুর ডিনামাইট আর গ্যাসোলিন থাকা চাই।'

ট্র্যাপ ডোর খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল বনি।

'আমরা যখন একই দলে,' বলল রানা, 'আমার অস্ত্র দুটো এবার ফেরত চাইব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' জ্যাকেটের পকেট থেকে ওয়ালথার আর ছুরিটা বের করে রানাকে ফিরিয়ে দিল প্রক্টর।

'পকেট এখনও ফোলা কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গ্রেনেড থাকলে একটা অন্তত দাও আমাকে।'

'এক বস্তা চাইলেও পাবে,' বলে পকেট থেকে একটা হ্যান্ডগ্রেনেড বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল প্রক্টর।

মই বেয়ে প্রক্টরের ছোকরারা ঘরে ঢুকছে। দেখতে দেখতে বড় কামরাটা ভরে উঠল। একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিল প্রক্টর।

'ইনি মাসুদ রানা। নিজের কাজ আমাদের সবার চেয়ে ভাল বোঝেন। আমার সঙ্গে ইনিও তোমাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। কাজেই বিশৃঙ্খলা যতই চরমে উঠুক, ওঁর ব্যাপারে ভুল বা বোকামি করতে পারবে না কেউ। মনে রাখবে, ওঁর ক্ষতি করা আর আমার ক্ষতি করা একই কথা। কেউ যদি আমার কথা বুঝে না থাকো, প্রশ্ন করো।'

সবাই চুপ করে থাকল।

'গুড। এবার বলি কি করতে হবে। আমরা এম.ভি. শাপলায় চড়ব। আমি দেখতে চাই জাহাজের এঞ্জিন উড়িয়ে দেয়া হয়েছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কোন চীনা বা বাঙালী যদি বাধা দেয়, মাথায় গুলি করবে। আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করা হয়েছে। এবার চলো।'

ফণা তোলা একদল সাপের মত উত্তেজিত তরুণরা অফিস কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল, লম্বা শেডের ভেতর দিয়ে ছুটে দরজা টপকাল, পৌঁছে গেল জেটির সঙ্গে সংযুক্ত ওয়াকওয়েতে। সব

মিলিয়ে, রানা ও প্রক্টর সহ বিশজনের কম নয়। নিজের সাবমেশিন গানটা মাফিয়া ডনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এটা তুমি রাখতে পারো, প্রক্টর।'

'ধন্যবাদ।' অস্ত্রটাকে শুভেচ্ছার নিদর্শন মনে করে রানাকে অকৃত্রিম হাসি উপহার দিল প্রক্টর। 'প্রথমে এটা খালি করি,' জ্যাকেট ঢাকা বেল্টে হাত চাপড়াল, 'তারপর রিজার্ভ তো আছেই।'

জেটিতে পৌঁছে রানা মুখ তুলেছে, ঠিক এই সময় হাতে মেগাফোন নিয়ে ফ্লাইং ব্রিজের কিনারায় দেখা গেল কবীর চৌধুরীকে। তার পাশে চীনা ক্যাপটেনও রয়েছে।

'নিচে সমস্যাটা কি, ডন প্রক্টর?' মুখের সামনে মেগাফোন তুলে চিৎকার করল কবীর চৌধুরী। 'ক্রেন থামল কেন?'

প্রক্টর বাহিনীর সামনের সারি গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে ছুটল।

সাবমেশিন গান তুলল প্রক্টর, ক্রেইন কেইবল লক্ষ্য করে দ্রুত এক পশলা গুলি করল। নীল ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল, টান টান কেইবল 'টোয়াং' শব্দ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড কন্টেইনারটা দোল খাচ্ছিল, বিকট শব্দে শাপলার হোল্ডে খসে পড়ল সেটা। এক মুহূর্তের জন্যে জমাট বাঁধল নিস্তব্ধতা। তারপর এক সঙ্গে বহু লোকের চিৎকার ভেসে এল।

ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হলো না, কি ঘটছে নিজেই টের পেল কবীর চৌধুরী। একটা ঘূর্ণির মত ঝাপসা দেখাল তাকে, ক্যাপটেনের উদ্দেশে হাত নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করল, সবশেষে দৌড় দিল হুইলহাউসের দিকে। ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকল সে, ডেকে উপস্থিত নিজের লোকজনকে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে।

উইন্ডিং অ্যাক্স হাতে কয়েকজন চীনা রেইলিং লক্ষ্য করে ছুটল। কুড়ালের দ্রুতগতি উত্থান-পতন শুরু হতে চকচকে ধাতবের ওপর আলোর প্রতিফলন ঝিক্ করে উঠতে দেখল রানা, শাপলাকে জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা মোটা হযার-এ কামড় বসাচ্ছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাঝামাঝি পৌঁছে থামছে প্রক্টর। সাবমেশিন গানটা আবার তুলল সে। এক ঝাঁক বুলেট ঘন ঘন ঝাঁকাল রেইলিংটাকে; কিছু বুলেট সরাসরি ঢুকে ছিন্নভিন্ন করল নরম মাংস, কিছু হাড় ভাঙল। ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ছে চীনারা। তাদের আর্তনাদে রাতের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

ফ্লাইং ব্রিজের দিকে ল্যুগার তুলে একটা গুলি করল রানা হুইলহাউসের নিচে, জানালার স্টীল ফ্রেমে লাগল সেটা। ঝট করে মাথাটা নিচু করে নেয়ায় কবীর চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছে না ও। তারপর আবার যখন মাথা তুলল, ওর হাতে পিস্তল দেখা গেল।

ইতিমধ্যে ডেকে পৌঁছে গেছে ওরা।

'বনি,' বলল প্রক্টর, হাঁপাচ্ছে, 'দশজনকে সঙ্গে নিয়ে রানার সঙ্গে যাও তুমি। সঙ্গে ডিনামাইট রাখো। বাকি সবাইকে নিয়ে হুইলহাউস আর বো-র দিকে যাচ্ছি আমি।' নির্দেশ দিয়ে কিছু শোনার অপেক্ষায় থাকল না সে, ঘুরেই ছুটল, সামনে ডেকে কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করছে। একজন চীনাকে গলা খামচে ধরতে দেখল রানা, গলা ও বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—তারপর দড়াম করে পড়ে গেল।

জাহাজের ভেতর ঢুকল রানা, বনি আর তার দল ওর পিছনে, সবাই একটা কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে বাঁধ ভাঙা পানির মত নিচে নামছে। রানার নিচে একজন চীনা এক হাঁটু মেঝেতে গেড়ে রাইফেল তুলল। রানার পাশে গুলির শব্দ হলো। চীনা লোকটা পেট চেপে ধরে উল্টে পড়ল পিছনদিকে।

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল ঝড়ের বেগে নিচে নামছে বনি, মুখে দাঁত বের করা নিঃশব্দ হাসি, ডেকগুলোকে একের পর এক পিছনে ফেলে আসছে। ওদের পিছনে গুলি হলো। বনির এক সঙ্গী গুঙিয়ে উঠে বাড়ি খেলো দেয়ালে, ফুটবলের মত ফিরে এসে কম্প্যানিয়নওয়ের কিনারা থেকে খসে পড়ল নিচে।

এক সময় গোলাগুলি থেমে গেল। লোহার ধাপে এখন শুধু

পায়ের শব্দ। সামনে একটা তীরচিহ্ন দেখতে পেল রানা, এঞ্জিন রুমটাকে নির্দেশ করছে।

একটা করিডরে নামল ওরা। সামনের একটা ইস্পাতের দরজা খুলে গেল, ভেতরে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল দেখা যাচ্ছে। বুলেটগুলো অনেক ওপর দিয়ে এল, দেয়ালে লেগে সিলিঙের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ল রানা, গড়িয়ে দেয়া শরীর থামতেই একটা গুলি করল। রাইফেলের পিছনে গুঙিয়ে উঠল কেউ। দরজার সামনে পৌঁছে গেছে রানা। মেঝে থেকে মাথা তুলে উঁকি দিল ও, চৌকাঠের ভেতর তাকাতে সামনেই একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখল, তারপর আরও একটা কম্প্যানিয়নওয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। বাতাসে শিস কেটে ওর মাথাকে পাশ কাটাল একটা বুলেট, পিছনের বাল্কহেডে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে গেল।

বনি আর তার সঙ্গীদের ইশারায় সরে থাকতে বলল রানা।

কম্প্যানিয়নওয়ের নিচে এঞ্জিনরুম দেখতে পাচ্ছে ও। প্রকাণ্ড আকারের পিস্টনগুলো, পালিশ দিয়ে আয়নার মত চকচকে করা, অলসভঙ্গিতে সচল হচ্ছে। ইউনিফর্ম পরা একজন চীনা এঞ্জিনিয়ার ব্যগ্রভাঙ্গিতে হাত নেড়ে চুই-মুই-চুই-মুই ক[illegible] কি-সব বলছে। যে-যার স্টেশনে পৌঁছাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে ক্রুরা। আরেকটা বুলেট রানার মাথায় একটুর জন্যে লাগল না এঞ্জিনরুমের শেষ প্রান্তে একটা দরজায় দেখা যাচ্ছে, এক লাইনে ছ'জন চীনা বেরিয়ে এসে ক্যাটওয়াকে শুয়ে পড়ল, প্রত্যেকের হাতে জ্যান্ত হয়ে উঠল একটা করে রাইফেল।

বাইরে থেকে টেনে ভারী দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, উল্টোদিকের গায়ে রাইফেলের বুলেট মাথা কুটছে। সিধে হয়ে বনির দিকে ফিরল ও। 'ভেতরে ঢোকার পথ ওদের দখলে, বনি।'

'কি করতে হবে বলুন।'

'ডিনামাইটের একটা স্টিক দাও আমাকে,' বলল রানা।

স্টিকটা নিয়ে ফিউজে আগুন ধরাল। 'ক্যাটওয়াকটা উড়িয়ে দেব। বিস্ফোরণের পর সবাইকে ভেতরে ঢুকতে হবে। তার আগে পর্যন্ত মেঝেতে শুয়ে থাকো।'

পায়ের নিচে কাঁপতে শুরু করেছে ডেক। ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে এঞ্জিনগুলো। ওপরের ডেকে কবীর চৌধুরীর কি অবস্থা কে জানে। প্রক্টর যদি তাকে কাবু করতে না পারে, চীনা ক্রুরা যদি হযার কেটে জাহাজকে জেটি থেকে মুক্ত করে ফেলে, শাপলার রওনা হওয়া ঠেকানো যাবে না। আর একবার রওনা হতে পারলে খোলা সাগরে পৌঁছানো সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে চওড়া কামরার ভেতর স্টিকটা ছুঁড়ে দিল রানা। পিছিয়ে আসার আগে কবাট বন্ধ করতে ভোলেনি। বিস্ফোরণের পর, সঙ্গে সঙ্গেই, আবার খুলল সেটা। ক্যাটওয়াক মড়মড় শব্দে মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ছে। রাইফেলধারীরা চিৎকার করছে—কারও হাত নেই, কারও পা উড়ে গেছে, কেউ হাঁ করে তাকিয়ে আছে সদ্য বেরিয়ে আসা নিজের নাড়িভুঁড়ির দিকে। ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় যে যা পারল আঁকড়ে ধরল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না, সবাইকে নিয়ে নিচে ধসে পড়ল ক্যাটওয়াক।

চৌকাঠ টপকে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটল রানা, ঝড়ের বেগে নিচে নামছে। কোথায় ছিল কে জানে, এক নাবিক ওর হাত ধরার চেষ্টা করল। ওয়ালথার দিয়ে বাড়ি মেরে কপালের হাড় গুঁড়ো করে দিল ও।

রানার সামনে এঞ্জিনিয়ার, মেঝে থেকে সিধে হবার সময় বেল্ট থেকে পিস্তল বের করছে। ওয়ালথারের বুলেট চিবুকের নিচ দিয়ে পথ করে নিয়ে মগজে ঢুকল। পিছন থেকে আরও গুলির শব্দ আর চিৎকার ভেসে এল। ওয়াল ব্রাকেট থেকে একটা কুড়াল টেনে নিল এক চীনা, ওর দিকে ঘুরছে। চকচকে ফলা ওর মাথার ওপর উঠে গেল, এই সময় লোকটার মুখে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানল ও। মগজ বেরিয়ে ছুটল চারদিকে, খসে পড়ল কুড়াল

কারও বুলেট রানাকে পাশ কাটাল, গুঁড়িয়ে দিল একটা গেইজ। ঘুরে তাকাতে চীনা ক্রুকে দেখতে পেল ও, রাইফেল তুলে আবার লক্ষ্যস্থির করছে। মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে ট্রিগার টানল রানা। নিঃশব্দে ঢলে পড়ল লোকটা, বাম বুকের শার্টে রক্তগোলাপ ফুটছে–রাইফেলটা তার গায়ের ওপর পড়ল।

রানার চারপাশ থেকে গুলি হচ্ছে, ইস্পাতে লেগে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করছে বুলেটগুলো। মাঝে-মধ্যে কেউ চিৎকার করছে বা অভিশাপ দিচ্ছে–ভারী বস্তার মত একটা লাশ পড়ল, কেউ হঠাৎ কেঁদে উঠল, বিচ্ছিন্ন একটা মাথা গড়িয়ে গেল সামনে দিয়ে। মাথাটা চিনতে পারল রানা, বনির এক সঙ্গীর–চাইনিজ কুড়ালের শিকার।

তারপর গোলাগুলি থেমে গেল।

চারদিকে তাকাবার সময় বনিকে দেখতে পেল রানা। বুকের নিচে, শরীরের একটা পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁকে রক্ত। খালি হাতটা ওপরে তুলল, পিস্তলটা বিজয়ীর ভঙ্গিতে নাড়ছে, মুখে নিঃশব্দ হাসি। 'আমরা জিতেছি!' গলা ফাটাল সে।

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'এসো, ডিনামাইট সেট করে কেটে পড়ি।'

তার সঙ্গীরা এরই মধ্যে প্রকাণ্ড সব মেশিনের গায়ে ডিনামাইট স্টিক বসাতে শুরু করেছে।

'সিঁড়ি হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও সবাই,' নির্দেশ দিল রানা। 'ফিউজে আমি আগুন ধরাব।'

রানার নেতৃত্ব কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না। ডান দিকে একটু কাত হয়ে আছে বনি, এক লোক তাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহায্য করল।

দ্রুত এক বান্ডিল থেকে আরেক বান্ডিলের দিকে চলে যাচ্ছে রানা, প্রতিটি ফিউজে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছোঁয়াচ্ছে। আতসবাজির মত ফুলকি ছড়িয়ে পুড়তে শুরু করল ওগুলো।

এবার এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল রানা। ওপর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাগাদা দিচ্ছে বনি। এই সময় তার পিছনের করিডর থেকে চিৎকার আর গুলির শব্দ ভেসে আসতে শুনল রানা। কে যেন বাংলায় অশ্রাব্য একটা খিস্তি করল। বনির চোখ দুটো অসম্ভব বড় হয়ে উঠল। শিরদাঁড়া পিছনদিকে বাঁকা হয়ে গেল তার, হাত দিয়ে পিঠ খামচে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে শরীরটাকে প্রায় দু'ভাঁজ করে ফেলল। নিজের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না, সিঁড়ি থেকে খসে পড়ল নিচে, সন্দেহ নেই মারা গেছে।

দরজার সামনে হাবিব আর নাদিমকে এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। তারপর ভারী ধাতব শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল দরজার কবাট।

ফাঁদে আটকা পড়ে গেল রানা।

এঞ্জিন রুমে গাঢ় অন্ধকার, সেই অন্ধকার ছিন্ন করছে শুধু জ্বলন্ত ফিউজের হলুদ ফুলকি। এম.ভি. শাপলাকে অচল করে দিতে সফল হবে রানা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে সেটাই হবে ওর জীবনের শেষ কাজ।

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওই পাঁচ বান্ডিল ডিনামাইট স্টিক কবীর চৌধুরীর জাহাজ থেকে স্টার্নকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, আর রানার জন্যে ওটা পরিণত হবে উড়ন্ত কফিনে।

চোদ্দ

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, সময়ের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারলে মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব হলেও হতে পারে। কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে ছিটকে আরও দূরে সরে এসে প্রথম ফিউজটা নিভিয়ে ফেলল রানা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও জিতছেও। সম্ভবত দশ সেকেন্ড হাতে থাকতেই শেষ ফিউজটা নিভিয়ে ফেলল ও।

একটা কাঠি জ্বেলে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে ফিরে আসছে রানা। নিঃশব্দ পায়ে ওপরে উঠছে। আগে হোক বা পরে, জাহাজটা যদি চালাতে চায় কবীর চৌধুরী, এই দরজা দিয়ে কাউকে না কাউকে এঞ্জিনরুমে নামতে হবে। তার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে রানা। পিস্তলের ম্যাগাজিন বদলে নিল ও।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রস্টরের দেয়া হ্যান্ডগ্রেনেডটা মুঠোয় ভরল ও। জানে, খুব বেশিক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হবে না। নষ্ট করার মত সময় কবীর চৌধুরীর হাতে নেই।

তবে সুযোগটা এলে, দ্রুত সেটা সদ্ব্যবহার করতে হবে রানাকে। ব্যর্থ হবার কোন অবকাশ নেই।

বাইরে কারা অপেক্ষা করছে জানে রানা। নাদিম আর হাবিবের নেতৃত্বে কবীর চৌধুরীর একদল স্যাঙাৎ এঞ্জিনরুম দখল করার দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের হাতেই খুন হয়েছে বনি। সংখ্যায় ওরা ক'জন বলা মুশকিল, রানা শুধু নাদিম আর হাবিবকে দেখেছে।

দরজা বন্ধ করার আগে তারা যদি জ্বলন্ত ফিউজ দেখে থাকে, এতক্ষণ বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা, এখন ভাবছে দেরি হবার কি কারণ। সন্দেহ নেই, অধৈর্য হয়ে উঠছে তারা।

লম্বা একটা হ্যান্ডেল-এর সাহায্যে দরজাটা খুলতে হয়, দুই পিঠে একটা করে। বাইরের হাতল ঘোরালে ভেতরের হাতলও ঘুরবে। এটাই রানার বাড়তি সুবিধে। ওকে চমকে দেয়া যাবে না। এক হাতের আঙুলের ডগা হাতলে রাখল ও, নড়া বা কাঁপনের ক্ষীণতম আভাস ধরার জন্যে প্রতিটি নার্ভ সজাগ। অপর হাতে ধরে আছে গ্রেনেড।

তাসত্ত্বেও ওকে প্রায় চমকে দিয়েই শুরু হলো ব্যাপারটা, এত দ্রুত যে হাতলটা ওর নিয়ন্ত্রণে থাকল না। আলো লাগায় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। তবে দরজার আড়াল পাওয়ায় পিন খুলতে যা দেরি, শুধু লম্বা করা হাত থেকে করিডরে গড়িয়ে দিতে পারল গ্রেনেডটা, পুরো শরীর বের করতে হলো না। মেঝেতে ওটা একবার ড্রপ খেতেই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বিস্ফোরণের ভোঁতা শব্দের পর আর কিছু শোনা গেল না। আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ ভেসে এল আরও কয়েক সেকেন্ড পর।

হাতল ছেড়ে দিয়ে আবার এঞ্জিন রুমে নামল রানা। দ্রুত আগুন দিল বারুদের সলতেগুলোয়, উঠে এসে দরজাটা সাবধানে খুলল করিডরে চারটে লাশ পড়ে আছে, তাদের মধ্যে নাদিম আর হাবিবকে চিনতে পারল ও। দরজা বন্ধ করে ছুটল, মনে মনে গুনছে–'ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান...'

চারবার গুনে মেঝেতে ডাইভ দিল রানা। বিস্ফোরিত ডিনামাইট কাঁপিয়ে দিল গোটা জাহাজকে। মাথার ওপর বার কয়েক নিভু নিভু হলো আলোগুলো। ধীরে-ধীরে স্থির হলো এম.ভি. শাপলা।

মেঝে থেকে উঠে ওপর দিকে রওনা হলো রানা, উদ্দেশ্য বো-

তে পৌঁছানো। প্রক্টরকে জাহাজের মাঝখানে রেখে এসেছে ও, যুদ্ধ করে সামনের দিকে এগোতে দেখে এসেছে। এখন তার কি অবস্থা জানা নেই, তবে বো-র দিক থেকে রানা বেরুতে পারলে ক্রুদের পিছনে থাকবে ও। বলা যায় না, প্রক্টরের হয়তো একটা ডাইভারসন দরকার।

একের পর এক লম্বা করিডর পেরুল রানা, অনেকগুলো কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে উঠতে হলো। হঠাৎ খেয়াল করল করিডর খাড়া লাগছে। তার মানে জাহাজ পিছন দিকে ডেবে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই এঞ্জিন রুমের গায়ে গর্ত তৈরি হয়েছে, পানি ঢুকছে ভেতরে।

একটা কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় হ্যাচওয়ে দেখতে পেল রানা। উঠে এসে ভেতরে মাথাটা গলিয়ে দিল। ওর সামনে জাহাজের বো। লাফ দিয়ে ডেকে উঠে পড়ল ও। আশপাশে লোকজন আছে, তবে তারা খুব ব্যস্ত, ওকে দেখতে পায়নি। তিনজন চীনা একটা হ্যাচ কাভারের পিছনে দাঁড়িয়ে রাইফেল চালাচ্ছে মিডশিপ-এর দিকে। তাদের প্রত্যেকের জন্যে মাত্র একটা করে বুলেট বরাদ্দ করল রানার ওয়ালথার।

ডেকের এদিকটায় কেউ নেই। ফ্লাইং ব্রিজে এখনও মাজল ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে। মাথা নিচু করে প্রক্টর বাহিনীর দিকে ছুটল রানা। ওদের একটা লাইফবোটের পিছনে ও। প্রক্টর বেঁচে আছে। সঙ্গে মাত্র দু'জন সঙ্গী, তাদের একজন আহত। বাকি সবাই মারা গেছে। ডাইভ দিয়ে তাদের মাঝখানে পড়ল রানা। 'কি অবস্থা?' জানতে চাইল।

ব্রিজ লক্ষ্য করে একটা গুলি করল প্রক্টর। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার অনেক লোক মারা গেছে। ক্যাপটেন আর কবীর চৌধুরী ব্রিজ দখল করে রেখেছে।'

'বনি আর তার সঙ্গীরা বেঁচে নেই,' বলল রানা। 'তবে এঞ্জিন রুম উড়ে গেছে।'

'জানি।' মাথা ঝাঁকাল প্রক্টর। 'আওয়াজ শুনেছি আমরা। তবে চৌধুরীকে খতম না করে আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'প্রক্টর, ওকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

'প্রশ্নই ওঠে না।' হিংস্র বাঘের মত দেখাল মাফিয়া চীফকে। 'ওর সঙ্গে এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। আমাকে ঠকিয়ে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কেউ।'

লাইফবোটের খোলে বুলেট এসে লাগছে।

'এখানে থেকে কোন লাভ হচ্ছে না,' আবার বলল প্রক্টর। 'ব্রিজের নিচে ওই সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুতে হবে আমাদের। ব্রিজ থেকে ওখানে গুলি করা কঠিন হবে।'

'সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছালে। তারপর? তোমার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'এই, আমাকে একটা গ্যাসলিন ক্যান দাও,' বলে রানার দিকে তাকাল প্রক্টর। 'প্ল্যান আবার কি? স্রেফ চার্জ করব। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আগুন ধরিয়ে দেব ব্রিজে। শালা বেঈমান পুড়ে মরুক।'

'চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি।'

লাইফবোটের দুই প্রান্ত থেকে ছুটে বেরুল ওরা। টার্গেট দুটো দেখে কে কোনদিকে গুলি করবে ঠিক করতে দু'সেকেন্ড দেরি করে ফেলল ক্যাপটেন ও কবীর চৌধুরী। তবে এই দু'সেকেন্ডে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হলো না। আবার ফ্লাইং ব্রিজ থেকে গুলি হলো। প্রক্টরের আহত যোদ্ধার হাঁটু ভাঁজ হয়ে যেতে দেখল রানা। হড়কে গেল শরীরটা, রেইলিঙের তলা দিয়ে খসে পড়ল নিচের জেটিতে।

ওদের চারদিকের ডেক ক্ষতবিক্ষত করছে বুলেটগুলো। তবে আর কোন ক্ষতি হবার আগেই সিঁড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। প্রক্টরের কথাই ঠিক, ফ্লাইং ব্রিজ থেকে গুলি করার ভাল অ্যাঙ্গেল

পাচ্ছে না ক্যাপটেন বা কবীর চৌধুরী।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বুলেটগুলো ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটা রাইফেলের যেন ডানা গজিয়েছে, বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর সশব্দে খসে পড়ল ডেকের ওপর। চৌধুরীদের অ্যামিউনিশনে টান পড়েছে, এ তারই ইঙ্গিত।

গ্যাসলিনের ক্যান খুলে ফেলল প্রক্টর। সিঁড়ির মাথায় সবার আগে সে-ই পৌঁছাল। তার পিছন থেকে কবীর চৌধুরী ও ক্যাপটেনকে দেখতে পেল রানা, পিছু হটে দরজা দিয়ে হুইলহাউসে ঢুকছে। হুইলহাউসের ভেতর অদৃশ্য হবার আগে শান্ত ভঙ্গিতে ধৈর্যের সঙ্গে একটা গুলি করল কবীর চৌধুরী। প্রক্টরের সঙ্গীকে ঝাঁকি খেতে দেখল রানা, পরমুহূর্তে ঢলে পড়ল সিঁড়ির মাথায়। তাকে টপকে প্রক্টরের পাশে চলে এল রানা।

ফ্লাইং ব্রিজে ওরা এখন মাত্র দু'জন।

আঙুল তুলে হুইলহাউসের জানালাগুলো দেখাল প্রক্টর। প্রতিটি জানালার কাঁচ গুলি লেগে ভেঙে গেছে। ওই আঙুল দিয়েই গ্যাসলিন ক্যানটা রানাকে দেখাল মাফিয়া ডন। ক্যানটা একটা ফাঁকের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে উপুড় করল সে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। রানা দেখল ক্যাপটেন প্রক্টরের ওপর লক্ষ্যস্থির করছে। দরজার বাইরে বেরিয়ে আছে অর্ধেক কপাল আর একটা চোখ। ওয়ালথার তুলে একটাই গুলি করল রানা। ক্যাপটেনের অর্ধেক কপাল আর চোখ কুয়াশার মত এক রাশ লাল রক্তকণার ভেতর হারিয়ে গেল, দরজার ভেতর থেকে হড়কে ব্রিজে বেরিয়ে এল লাশটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল, প্রক্টর সিধে হয়েছে, দেশলাইয়ের জ্বলন্ত একটা কাঠি ফেলছে জানালার ভেতর।

এই সময় তাকে গুলি করল কবীর চৌধুরী।

তবে একটু দেরি করে ফেলল সে। জ্বলন্ত কাঠিটা হুইলহাউসে

পড়ে গেছে। হুস্-স্-স্ করে একটা ভারী শব্দ হলো, সেই সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠে লাল শিখায় ভরে উঠল কামরাটা।

প্রক্টর এখনও দাঁড়িয়ে, মুখে বোকা বোকা হাসি। 'সত্যি করে বলো তো, রানা,' জিজ্ঞেস করল সে, 'দেশের প্রতি যে অন্যায় আমি করেছি, এতে করে কি তার প্রায়শ্চিত্ত হলো?'

যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে বসিয়ে দিল। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল সে। মরার আগে ঠিকানাটা জানিয়ে গেল প্রক্টর—বাকি সোনা যেখানে মজুদ করা হয়েছে।

এগিয়ে এসে তার কব্জিটা ধরল রানা। না, পালস নেই।

জানালার প্রতিটি ভাঙা অংশ থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। হুইলহাউসের ভেতরে কবীর চৌধুরী একা, তবে এরকম একটা দাউ-দাউ আগুনের ভেতর তার বেঁচে থাকার কথা নয়।

এবাব ফিরতে হয় রানাকে। ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

'রানা!' পিছন থেকে সেই পরিচিত গলা ভেসে এল।

যখন ঘুরছে, কি দেখবে জানে না, গায়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার।

সরাসরি আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সে, অথচ কিছুই পোড়েনি বা পুড়ছে না। কারণটা অবশ্য পরিষ্কার। অ্যাস্ট্রনটদের মত ফোলা একটা সুটে শরীরটা মোড়া, হেড গিয়ার সহ। ওটা নিশ্চয়ই অ্যাসবেসটসের তৈরি, ফায়ারপ্রুফ ও হিট-রিজিস্ট্যান্ট।

বিস্ময় যত বড় ধাক্কাই দিক, রানা প্রফেশনাল, কবীর চৌধুরী আগুন থেকে বেরিয়ে আসতেই ওয়ালথার তুলে গুলি করল। পিস্তল কবীর চৌধুরীর হাতেও, গুলি করার প্রস্তুতি নিয়েই রানাকে ডেকেছে, সে-ও গুলি করল। নিয়তির কৌতুকই বলতে হবে, দুটো পিস্তলের খালি চেম্বারে ক্লিক করল হ্যামার—বুলেট নেই।

হেলমেটের মত হেড গিয়ারটার মাথা থেকে নামাল কবীর চৌধুরী। রানার চোখে চোখ রেখে হাসছে সে। 'কেহ কারে নাহি

জিনে সমানে সমান?' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে পিছু হটল, আবার আগুনের ভেতর ঢুকছে–হেড গিয়ারটা মাথায় পরে নিল। অ্যাসবেসটস সুট ঢাকা পড়ে গেল গোলাপী চাদরে। ইতিমধ্যে খিলখিল শব্দে নাচতে নাচতে ব্রিজের কিনারা ধরে এগোতে শুরু করেছে শিখাগুলো।

হুইলহাউসের ভেতর খুদে একটা গোপন লিফট থাকা খুবই সম্ভব। কিন্তু কথাটা রানার সময় মত মনে পড়েনি। একটা ঘোরের মধ্যে ছিল ও, শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি যেন কেউ শুষে নিয়েছে, বলতে পারবে না কখন বা কিভাবে নেমে এসেছে জেটিতে। বাতাসে ভর করে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ ঘোর ভাঙতে সাহায্য করল খানিকটা। পিছন ফিরে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো এতক্ষণ কোন দুঃস্বপ্নের ভেতর ছিল না ও। ফায়ার ব্রিগেডের কয়েকটা গাড়ি জেটির মাথায় এসে থামল, শাপলার ব্রিজে যে আগুন জ্বলছে তার তুলনায় হেডলাইটগুলোকে নিষ্প্রভ লাগল চোখে।

দমকল কর্মীদের ভিড় ঠেলে রানা এজেন্সির জাকি আর মলিকে ছুটে আসতে দেখল রানা, সঙ্গে নীল সুট পরা কয়েকজন এফবিআই অফিসার।

পনেরো

ডন প্রক্টরের ছেলেরা ভুল বুঝে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে, এরকম একটা আশঙ্কা থাকায় রানা এজেন্সির এজেন্টরা তাদের ডিরেক্টরকে ডকইয়ার্ড থেকে সরাসরি একটা সেইফ হাউসে নিয়ে

এল। তাদের সযত্ন সেবা আর সতর্ক প্রহরায় পরবর্তী বত্রিশ ঘণ্টা কয়েক দফায় নিশ্চিন্তে ঘুমাল রানা, তিনবার গোসল করল, থাই ও চাইনিজ রেসিপির সাহায্যে মলির তৈরি প্রতিটি সুস্বাদু ডিশ উপভোগ করল আয়েশ ও তৃপ্তির সঙ্গে।

মলির কঠিন নির্দেশ থাকায় এই সময়টায় রানাকে কোন কাজ করতে দেয়া হয়নি। রানার অনেক প্রশ্ন ছিল, তার মধ্যে মাত্র একটার উত্তর দেয়া হয়েছে ওকে।

হ্যাঁ, এম.ভি. শাপলার হুইলহাউসে ছোট্ট একটা ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটারপ্রুফ ক্যাপসুল লিফট ছিল। শ্যাফটটা নিচের সবগুলো ডেককে পিছনে ফেলে এঞ্জিনরুমের পাশ ঘেঁষে খোলের বাইরে পৌঁছেছে। বাইরে, খোলের গায়ে, লম্বা একটা ফ্রেম পাওয়া গেছে। এফবিআই এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে বলছে, ওই ফ্রেমে সম্ভবত একটা মিনি সাবমেরিন আটকে রাখা ছিল।

না, শাপলার হুইল হাউসে চীনা ক্যাপটেন ছাড়া আর কারও লাশ পাওয়া যায়নি।

এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে না কবীর চৌধুরী কিভাবে পালিয়েছে।

বত্রিশ ঘণ্টা পর রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায় অফিস করতে এল রানা। উপস্থিত এজেন্টদের নিজের চেম্বারে ডেকে নিল ও। সবাই চেয়ার টেনে বসার পর বলল, 'হ্যাঁ, রিপোর্ট করো। তোমাদের পৌঁছুতে অত দেরি হলো কেন?'

প্রথমে শুরু করল জাকি। ফোনে রানার নির্দেশ পেয়ে ফিলিপাকে সেইফ হাউস থেকে বের করে আনে ওরা। জাতিসংঘ ভবনের সামনে অপেক্ষা করছিল, তিনটে গাড়ি করে মুখোশ পরা ছয়-সাতজন লোক এসে ঘিরে ফেলে ওদেরকে, তারপর ফিলিপাকে নিয়ে চলে যায়। রানার স্পষ্ট নিষেধ ছিল, তাই গাড়িগুলোকে অনুসরণ করা হয়নি। তবে ফিলিপার হাতব্যাগের হাতলটা বদলে দিয়েছিল ওরা, নতুন লাগানো হাতলের ভেতর

একটা ব্লীপার ছিল। যদিও তাতে কোন লাভ হয়নি, কারণ ওদের চোখের সামনেই হাতব্যাগটা গাড়ি থেকে ফেলে দেয়া হয়।

এরপর ওখান থেকে ম্যানহাটন ব্রিজ সংলগ্ন মাফিয়া ডন গ্রেগরি প্রক্টরের হেডকোয়ার্টারের সামনে চলে আসে ওরা। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে প্রক্টর ওখানে নেই। ইনফরমাররা বলতে পারেনি কোথায় গেছে সে। ওখান থেকেই টেলিফোনে কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলিকে ফোন করা হয়। কয়েক হাজার টন সোনা চুরি গেছে, এ-কথা শুনে এফবিআইকে খবর দেয়ার আগে হোয়াইটহাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন লরেলি। হোয়াইটহাউস সঙ্গে সঙ্গে এফবিআইকে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল অথচ এফবিআই-এর কোন তৎপরতা চোখে পড়ল না। শুনে লরেলি আবার যোগাযোগ করলেন হোয়াইটহাউসের সঙ্গে। এরপর প্রেসিডেন্টের বিশেষ জরুরী নির্দেশে এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মিস্টার টেনিনকে বরখাস্ত করা হয়—তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের একটি হলো, মাফিয়া ডন প্রক্টরের এক ছেলে তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিয়মিত হেরোইন খাইয়ে প্রায় ক্রীতদাসী বানিয়ে রেখেছে, সব জেনেও মিস্টার টেনিন কোন ব্যবস্থা নেননি, বরং প্রক্টরের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন।

যাই হোক, ডিরেক্টর স্বয়ং ফিল্ডে নামায় এফবিআই সদস্যরা তদন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাজার হাজার টন সোনা পাচার করতে হলে বন্দর ব্যবহার না করে উপায় নেই। এই ধারণা থেকে বিভিন্ন ডকইয়ার্ডে হানা দেয় এফবিআই ও পুলিস। কিন্তু নিউ ইয়র্ক নদী বন্দরে ডকইয়ার্ডের সংখ্যা এত বেশি, প্রাইভেট জেটিও গুনে শেষ করা যাবে না, খোঁজ নিতে প্রচুর সময় লাগছিল। প্রক্টরের ছেলেরা চালায়, এরকম চারটে ডকইয়ার্ডে হানা দিয়ে কিছুই পাওয়া যায়নি। যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা, এই সময় একটা হাসপাতাল থেকে রানা এজেন্সির অফিসে ফোন করল ফিলিপা।

সে-ই জানাল প্রক্টরের ডকইয়ার্ডটা কোথায়, সেখানে কি ঘটছে।

'ফিলিপা হাসপাতাল থেকে ফোন করল কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'প্রক্টরের ডকইয়ার্ড থেকে পালাবার সময়ই ওর বাবা মিস্টার ফ্লয়িড ডকিং-এর বুকে ব্যথা শুরু হয়,' বলল জাকি। 'এর আগে একবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক করেছিল, তাই ভয় পেয়ে যায় ফিলিপা। হাসপাতালে ভর্তি করার দু'ঘণ্টা পর তিনি মারা যান, মাসুদ ভাই।'

ফ্লয়িড ডকিং-এর মৃত্যু-সংবাদ শান্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে গ্রহণ করল রানা, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ফিলিপার কথা ভেবে। ভদ্রলোক মারাত্মক একটা অপরাধ করেছিলেন, বেঁচে থাকলে বাকিটা জীবন জেলখানায় কাটাতে হত, সেদিক থেকে ভাবলে বলতে হয় মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। তবে মানুষ হিসেবে তিনি মন্দ ছিলেন না, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে। 'ফিলিপার খবর কি? সে এখন কোথায়?'

'এফবিআই তাকে আপাতত নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখেছে,' বলল জাকি। 'মিস্টার ডকিংকে গতকাল কবর দেয়া হয়েছে। গোরস্থানে ফিলিপাকেও আনা হয়। এফবিআই চীফ তখন জানিয়েছেন, আজ সকালের দিকে তাকে ওঁরা ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন—প্রক্টর পরিবারের ওপর থেকে এফবিআই-এর গোপন সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ায় তার আর কোন ভয় নেই।'

'প্রক্টরের তো অনেকগুলো ছেলে, তাদের খবর কি?'

'তিন ছেলেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সেই ছেলেটাও আছে যে বলে বেড়াত এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের মেয়েকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। বাকি ছেলেদের যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পালিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে—আর কোনদিন ফিরবে না, এই শর্তে। ওদের গুদামে পাওয়া বিষাক্ত সমস্ত হেরোইন জব্দ করেছে ড্রাগস অ্যান্ড নারকোটিকস

ডিপার্টমেন্ট।'

'এম.ভি. শাপলার কি অবস্থা?'

'ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা সময়মত পৌঁছানোয় আগুন বেশি ছড়াতে পারেনি,' বলল মলি। 'তবে ওই জাহাজ কোন কাজে আসবে না, এঞ্জিন বলতে ওটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

'সোনা?'

রিপোর্টের বাকি অংশ মলির মুখ থেকে শুনল রানা। এম.ভি. শাপলার হোল্ড থেকে পাওয়া সোনা ফেডারেল রিজার্ভের ভল্টে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কাজটা করে ওয়াশিংটন থেকে আসা ট্রেজারীর কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররা। তার আগে ফেডারেল রিজার্ভের সঙ্গে জড়িত সব ক'জন গার্ড ও সিকিউরিটি অফিসারকে অ্যারেস্ট করা হয়। ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট থেকে আভাস দেয়া হয়েছে, নকল সোনার বার চিহ্নিত করতে পুরো এক হপ্তা লেগে যেতে পারে। ইতিমধ্যে উদ্ধার করা সোনার বার গুনে ওজনের হিসাব বের করা হয়েছে—সব মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার টন। ওরা বলছে, আরও সাত হাজার টন সোনার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

'হুঁ, জানি,' বলল রানা।

'কাল থেকে এফবিআই চীফ কয়েকবার ফোন করেছেন, মাসুদ ভাই,' বলল মলি। 'আপনার বিশ্রাম গ্রহণ শেষ হয়েছে কিনা জানতে চাইছেন।'

'কেন?'

'না, বলছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে উনি নিজে একবার আসতে চান।' হাসল মলি।

জাকি বলল, 'জানা কথা, ধন্যবাদ জানাতে এসে নিখোঁজ বাকি সাত হাজার টনের কথাও তুলবেন তিনি। হয়তো অনুরোধ করবেন ওটাও যেন আমরা উদ্ধার করে দিই।'

'সম্ভব হলে কেন উদ্ধার করে দেব না,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই

দেব।'

'মাসুদ ভাই, আমরা কি এখন ভদ্রলোককে ফোন করে জানাব যে আপনাকে অফিসে পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল মলি।

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল রানা। 'এখন নয়। পরে আমি বলব কখন। তার আগে খবর নাও ফিলিপা ফ্ল্যাটে পৌঁছেচে কিনা। তার ব্যাপারে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমি এখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

***

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য ৪০% কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

চীনে সঙ্কট

কাজী আনোয়ার হোসেন

শুরু হলো মাসুদ রানার সুইসাইডাল মিশন–রোমাঞ্চকর চীন অভিযান; সঙ্গে থাকছে আর্ট কলেজের দুই ভারতীয় ছাত্রী। আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে ড. কংসু চউ, অ্যাটম বোমা ফেলে বাংলাদেশকে নতি স্বীকার করাবে। শুরুতেই দু'জন পাকিস্তানী এজেন্ট খুন হয়ে গেল, হামলা হলো ভারতীয় ও বাংলাদেশী এজেন্টদের ওপর।
পাগল বিজ্ঞানী ওকে বাগে পেয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল।
এখান থেকে ছাড়া পেলেও রক্ষা নেই রানার, ওকে ধরার জন্যে রেগুলার আর্মি নিয়ে অপেক্ষা করছেন মেজর জেনারেল তাও চাও তিয়েন।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। –কা. আ. হোসেন।

কেশব

রোল ডি-১০ নাবিক নিবাস, নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-৪১০০

১৯৯৩ সালের কথা। আমার এক বন্ধুর কাছে হঠাৎ পেলাম স্বর্ণমৃগ বইটি। কৌতূহল বশে ঘরে এনে পড়লাম। উফ! কি এক নেশা! বই শেষ হতেই আবার ছুটলাম ওর কাছে রানার অন্য বইয়ের জন্য। কিন্তু বিধি বাম, আর নেই। কী আর করা, আবার পড়লাম একই বই। তারপর আবার, বারবার। এভাবেই আমার রানার নেশা শুরু। তারপর এস. এস. সি., এইচ. এস. সি, ডিগ্রী পাশ করলাম। কিন্তু রানা ছাড়তে পারিনি। বন্ধুরা টিটকারী দিত, বলত রানা হলো স্কুল লেভেলের বই। স্কুল পেরোলি তো রানাও শেষ। তখন পড়বি সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ। কিন্তু আমি তো সে-সবও পড়ি, কিন্তু তারপরও রানা ছাড়তে পারলাম কই?

প্রথমে লুকিয়ে পড়তাম। পরে জানতে পারলাম বরেণ্য রাজনীতিক রাশেদ খান মেননও রানা ভক্ত, এবং আরও পরে হুমায়ূন আহমেদের বাকের ভাইয়ের হাতেও রানার বই দেখলাম। তখন আমি অকুতোভয়। আর লুকিয়ে না, এবার প্রকাশ্যে পড়ি।

শিক্ষাজীবন শেষ করে এখন যখন কর্মজীবনের দ্বারপ্রান্তে, হঠাৎ দেখি আমার এই কর্মজীবনও রানা দ্বারা প্রভাবিত। আমি এখন নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী। সাগর ছিল রানার প্রিয় একটি সাবজেক্ট। রানার সাথে সাথে আমিও চষে বেড়িয়েছি অজানা কত সাগরতল, কত বন্দর, আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর, রেড সী--সর্বত্র। তখন থেকেই হয়ত মনের

গহীনে, অবচেতনে আমার এই কর্মজীবনের সূচনা। যাক, আমি সেজন্য রানার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওহো, বলতে ভুলেই গেছি, আমাদের একজন ইন্সট্রাক্টর আছেন, ক্যাপ্টেন রশীদ স্যার। জানি না উনিও আমার মত রানার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না, কেননা, তিনিও একজন রানা ভক্ত। জানি না, আমার মত বাংলাদেশে আরও কত হাজার হাজার রানাভক্ত প্রতিনিয়ত রানার দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

আর কাজীদা, না, আপনাকে কোনও কাগুজে শুভেচ্ছা দিব না, অন্তরের অন্তস্তলে বুঝে নিন। আর দয়া করে আমার ঠিকানাটা যদি ছাপেন তো কৃতজ্ঞ থাকব। কেননা, বাংলাদেশের প্রতিটি কোনায় আমি একজন করে বন্ধু চাই।

* আশাকরি রানার মতই তাঁরাও আপনাকে সুখে-দুঃখে সঙ্গ দেবেন। সুন্দর চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ।

বশীর চৌধুরী

এ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, ফরিদপুর।

বয়স এখন চুয়াল্লিশ চলছে আমার। সেই ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া অবস্থায় 'ধ্বংস-পাহাড়' দিয়ে মাসুদ রানায় হাতে খড়ি। এখন এই পরিণত বয়সেও একই আগ্রহ আর তৃপ্তি নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি মাসুদ রানা পড়া। আমার অনেক আইনজীবী বন্ধু আমার হাতে 'রানা' দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

রানার বর্তমান সংখ্যা (ভাইরাস x-99) শেষ করলাম। ভালোই লাগল টান-টান উত্তেজনায় কে.সি. অর্থাৎ কবীর চৌধুরীকে পেয়ে। তবে বইটির ৬৫ পাতায় 'বেরিয়ে এলো দু'জন সন্ত্রাসী'-র জায়গায় হবে সন্ন্যাসী। নির্ভুল ছাপায় রেকর্ডধারী সেবা প্রকাশনীর কোন বইতেই আমরা এ ধরনের ভুল আশা করি না। ধন্যবাদ।

* আপনাকেও ধন্যবাদ। চুয়াল্লিশ অবশ্য খুব বেশি কোনও বয়স নয়, তবু স্বীকার করতেই হবে এই বয়সে পৌঁছে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন বেশিরভাগ মানুষই। আপনি ধরে রেখেছেন শত ব্যস্ততার মধ্যেও, এজন্যে আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। ...ভুল তো ভুলই, দুঃখ প্রকাশ করলেও ভুল; পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি।

আখতার জাহান রুবী

সহ. শিক্ষিকা, নামোভদ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাজলা, রাজশাহী।

আপনাকে লিখি আমি প্রায় প্রতিদিনই, তবে তা মনে মনে। একটা

করে মাসুদ রানা পড়ে শেষ করি আর কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে লিখতে বসি। ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে কি ভাষায় লিখব, ভেবে পাই না, তাই আর লেখা হয় না।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দূরে থেকেও একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর একান্ত আপন জনে পরিণত হন। আপনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন।

ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধরনের বই আমার নিত্যসঙ্গী। একেক সময় একেক ধরনের লেখা ভাল লেগেছে। সময়ের আবর্তে সেই ভাল লাগায় পরিবর্তনও ঘটেছে। কিন্তু যেদিন থেকে মাসুদ রানা পড়া শুরু করেছি সেই থেকে আজ অব্দি রানার বইগুলো পড়তে গিয়ে কখনও ক্লান্তি অনুভব তো করিইনি, বরঞ্চ দিনে দিনে এর প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়েছে। বইগুলো যেন রানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতই চির তরুণ, চির নবীন।

দুঃখকষ্ট তো জীবনে আছেই, থাকবেও তবে তা আড়াল করে সবার সামনে কিভাবে হাসিমুখে দাঁড়াতে হয় তা শিখেছি আমি মাসুদ রানার বই পড়েই। আমি কৃতজ্ঞ।

* আমিও—এত সুন্দর গুছানো একটা চিঠি পেয়ে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শোভা

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

আমি মাসুদ রানার একজন নতুন ভক্ত। অনেকগুলোই পড়েছি, তার মধ্যে 'তুরুপের তাস', 'বোস্টন জ্বলছে' ও 'সন্ন্যাসিনী' খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। প্রায় সবগুলো বইতে দেখলাম, মেয়েরাই রানার প্রেমে পড়ছে। আপনি মেয়েদেরকে এত হ্যাংলা মনে করেন কেন? শুধুমাত্র মেয়েরাই রানার প্রেমে পড়বে, রানা পড়বে না?

রাগের মাথায় বেশি লিখে ফেললে ক্ষমা করে দেবেন। আসলে রানাকে আমারও ভাল লাগে। ও সত্যিই একজন আকর্ষণীয় পুরুষ! কিন্তু আপনি আবার ভেবে বসবেন না যে, আমিও ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

* না-না, তা ভাবিনি। তবে আপনিও ভেবে দেখুন, জীবনে কখনও আপনি ওকে দেখেননি, ও-ও আপনাকে একনজর দেখেনি, এই অবস্থায় চেষ্টা করলেও কি রানা আপনার প্রেমে পড়তে পারবে? অথচ নিজেই স্বীকার করছেন আপনার ওকে ভাল লাগে, ওকে একজন আকর্ষণীয় পুরুষ বলে মনে হয়। এরপর আর ওকে দোষ দেন কি করে? দোষ দেয়া উচিত ওই সব মেয়েদের, যারা ওকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়। তবে ওরাই বা

কি করে নিজেদের সামলাবে বলুন, ওরা তো জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রানাকে। না দেখেই আপনার কি অবস্থা হ[illegible] না?

লিনা

কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

সেবা প্রকাশনীর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। অনেক সিরিজই আমি নিয়মিত পড়ি। মাসুদ রানা আমার প্রিয় চরিত্র। এ বই পড়ার সময় সিনেমার মত সব ঘটনা মনের পর্দায় দেখতে পাই। খুব ভাল লাগে। 'রক্তলালসা' বইটি পড়ে ভাল লেগেছে। বিশেষ করে রূপা চরিত্রটি খুব ভাল লেগেছে। মাসুদ রানার পরবর্তী বইগুলোতে ওর মত চরিত্রের মেয়েদের দেখতে চাই। আপনাদের ধন্যবাদ।

* আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

আইরিন মেন্ডেজ

পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা-১২১৫

পৃথিবীর মেয়েদের আর তো কোন কাজ নেই যে, শুধু মাসুদ রানার পিছনে লেগে থাকে। তাও আবার চুম্বকের মত। আর কিশোরের উপর অধিকার না ফলালে জিনার শান্তি হয় না। ওর প্রতি কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করলে সুখী হব।

দয়া করে আমার রানার সাথে অন্য মেয়ের কোন সম্পর্ক দেখাবেন না। তাহলে মন ভেঙে খানখান হয়ে যায়। শুধু কি তাই? কান্নাও আসে। আর কিশোরকে বলবেন আমি ওকে খুব মিস করি। আপনি আর রকিবদা' আর একটু তাড়াতাড়ি বই বের করতে পারেন না?

আমি যে ধাঁধাটা দিলাম তার উত্তর অবশ্যই দেবেন।

তিন অক্ষরে নাম তার
বৃহৎ বলে গণ্য
পেটটি তাহার কেটে দিলে
হয়ে যায় অন্য।

* দুই সিরিজের ভিন্ন বয়সী দুই নায়ককে তুমি একাই বগলদাবা করতে চাও, এটা কেমন কথা বলো তো?

আরও তাড়াতাড়ি লেখার অনুরোধ করলাম রকিবদা'কে। তোমার ধাঁধাটির একাধিক উত্তর হতে পারে: হাঙর, গরিলা, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি। তোমার উত্তরটা কি শুনি?

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৮/৪/'০২ রহস্যপত্রিকা (১৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা) মে, ২০০২

৫-৫-'০২ সীমান্তে বিরোধ (ওয়েস্টার্ন) কাজী মায়মুর হোসেন

বিষয়: না দেখে র‍্যাঞ্চটা কিনল যুবক রন ডেনভার। ওখানে পৌঁছোনোর আগেই জানতে পারল, ঝামেলা আছে ওই র‍্যাঞ্চ নিয়ে। চোখের সামনে খুনীকে পালাতে দেখল ও, তারপর জড়িয়ে গেল খুনীর সঙ্গে। মানবতার খাতিরে খুনীর পক্ষই নিতে হলো ওকে। প্রতিপক্ষ ভয়াবহ মেক্সিকান দস্যু-সর্দার সরো আর তার বন্ধু প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার জন টেম্বলার। আরও আছে নিষ্ঠুর গানম্যান ডেপুটি রেমিরেজ। রনকে এল বার র‍্যাঞ্চে কিছুতেই থাকতে দেবে না ওরা। কিন্তু একটা কথা ওরা জানে না, বিপদ দেখলে পালাবার লোক নয় রন ডেনভার। রুখে দাঁড়াল ও। মেক্সিকান-আমেরিকান সীমান্তে বাধল বিরোধ। শুরু হলো এক অসম কিন্তু ভয়াবহ লড়াই।

৫-৫-'০২ তিক্ত অবকাশ ১+২ (রানা রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

আরও আসছে

১২/৫/'০২ ইসকুল বাড়ি (কিশোর উপন্যাস) কাজী আনোয়ার হোসেন

১১/৫/'০২ নেকড়ে মানবী (হরর) অনীশ দাস অপু

মাসুদ রানা

মুক্তিপণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফিলিপা নামের এক কিশোরী মেয়ের গল্প।
বাংলাদেশে বেড়াতে আসাই তার কাল হল।
তবে এটাকে চৌদ্দ হাজার টন সোনা লুটের কাহিনীও বলা যায়।
এরকম একটা কিছুর সঙ্গে পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীর নামটা কেমন যেন মানিয়ে যায়, তাই না?
আর আছে ড. ল্যাজারাস, বিষ খেয়েও ভাব দেখাচ্ছে খায়নি।এক মাফিয়া ডনের সঙ্গে হাত মেলাল মাসুদ রানা, তারপর তৈরী হল চরম এক আঘাতে সব ষড়যন্ত্র বানচাল করতে।
তবে ওর জন্যে ভয়ানক একটা চমক অপেক্ষে করছে।
হ্যা পাঠক, আপনার জন্যেও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০